বেদাঙ্গসূত্র – অষ্টম অধ্যায়

সুকুমারী ভট্টাচার্য

বেদাঙ্গসূত্র

উপনিষদগুলি যেমন নিছক আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে বিচ্ছেদের যুগ সূচনা করে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সঙ্গে নিশ্চিত পার্থক্য এবং পরবর্তী নূতন দার্শনিক সন্ধানের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, তেমনি উপনিষদের উত্তরসূরী বেদাঙ্গগুলিও পূর্ববর্তী যুগের সমগ্র ধর্মীয় সাহিত্যের সঙ্গে অপর একটি বিপুল বিচ্ছেদ সূচনা করেছিল। উপনিষদগুলির মত এই ছেদ সার্বভৌম নয় কেননা অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। তবে বেদাঙ্গ–বা বিশিষ্ট আঙ্গিকের জন্য 'সূত্র' রূপে অভিহিত–সাহিত্যধারার ক্ষেত্রে এই ছেদ অনেক বেশি মৌলিক, কারণ সূত্র-সাহিত্য অপৌরুষের নয়, মানুষের রচিত সাহিত্য-রূপেই এগুলি স্পষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে। বেদধ্যয়নে সহায়ক রচনারূপে বেদাঙ্গের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে।

প্রধান বেদাঙ্গগুলি মোট ছয় ধরনের : ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, শিক্ষা, জ্যোতিষ ও কল্প। কল্পসূত্রগুলি আবার চারভাগে বিন্যস্ত–শৌত, গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্ক। বেদাঙ্গকে অবশ্য কার্যকরীভাবে আমরা দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি। :-(ক) ধর্মসংক্রান্ত-এর মধ্যে শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা

যায় এবং (খ) পার্থিব-এর মধ্যে রয়েছে শুল্বসূত্র, শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিম ও নিরুক্ত। এছাড়াও আমরা কয়েকটি সহায়ক রচনাধারার উল্লেখ করতে পারি–প্রায়শ্চিত্ত,পরিশিষ্ট। শ্রাদ্ধকল্প ইত্যাদি।

রচনাকাল (বেদাঙ্গসূত্র)

সূত্রগুলির আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে গবেষকরা এই সাহিত্যের অধিকাংশ রচনাকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে রচিত বলে নির্দেশ করে থাকেন। সূত্র রচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ গোষ্ঠীর নামের সঙ্গে 'অয়ন' এই অন্ত্য প্রত্যয়টি যুক্ত রয়েছে–যেমন আশ্বলায়ন, বৌধায়ন ইত্যাদি। বিখ্যাত ভারততাত্ত্বিক হ্বেবার মনে করেন, এটা থেকে আমরা প্রতিষ্ঠিত রচয়িতা গোষ্ঠীগুলির সময় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করতে পারি। খ্রিস্টপূর্ব যুগের শেষ দুটি শতাব্দী এবং খ্রিস্টীয় প্রথম দুটি শতাব্দীকে বিদেশী প্রভাব আত্মীকরণের এবং এদের সঙ্গে আদিম জনগোষ্ঠীর ধর্মমতের সমন্বয় ও সংশ্লেষনের মাধ্যমে নূতন ধর্মীয় আন্দোলন সৃষ্টি করার পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপে চিহ্নিত করা যায়।

তাই সূত্র-রচনার যুগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে বুদ্ধপরবর্তী যুগে সূত্রধারার সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যজ্ঞনিষ্ট ধর্ম তখন কঠোর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। রূঢ় আঘাতের ফলে বৈদিক ধর্মের প্রাচীন রূপ আর কখনও প্রাক্তন গৌরব অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। এই যুগটি ছিল বহু বৈদেশিক আক্রমণেরও কাল; খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজ্ঞাণ্ডারের আক্রমণের পর থেকে উত্তর ভারত একাদিক্রমে শক, কুষাণ, জুন ও অন্যান্য গোষ্ঠীদ্বারা বহুবার আক্রান্ত হয়েছিল। এইযুগে উত্তর ভারতে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্য অর্থাৎ মৌর্য বংশের অভ্যুত্থান ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এসময়েই আমরা

প্রাগৈতিহাসিক স্তর অতিক্রম করে মৌর্য সম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক পর্যায়ে প্রবেশ করেছি। এটা ঘটেছিল প্রধান উপনিষদগুলি রচিত হওয়ার শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করেছি। এটা ঘটেছিল প্রধান উপনিষদগুলি রচিত হওয়ার শেষ পর্যায়ে যখন বেদাঙ্গযুগের প্রাচীনতর পর্যায়েরও সূত্রপাত; এই যুগে ভারতবর্ষ গ্রিস, রোম, মধ্যপ্রাচ্য, চীন ও দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে সমৃদ্ধিপূর্ণ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং ফলে দূরবর্তী দেশগুলি থেকে বাণিজ্যিক সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে নুতন ও অপরিচিত ভাবাদর্শ, আচার ব্যবহার, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস, দেশের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল। পাটলিপুত্র ও কৌশাম্বীর মত সমৃদ্ধিশালী নগরীর উত্থান সাধারণ আর্থিক প্রাচুর্যের প্রমাণ বহন করে, অন্ততপক্ষে বণিকশ্রেণী এবং শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও পুরোহিতদের সমৃদ্ধি যে বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রাচীন বৌদ্ধ রচনাসমূহে এই অভ্রান্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে সেযুগে দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত এবং বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের ফলে লাভের প্রভাবে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভব হয়েছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম এবং অন্যান্য প্রতিবাদী গোষ্ঠীর উত্থানের ফলে যজ্ঞনিষ্ঠ ধর্মের ভিত্তিমূল চুড়ান্তভাবে শিথিল হওয়ার পূর্বে পুরোহিতশ্রেণী যজ্ঞাপরায়ণে গোষ্ঠীর মধ্যে জাগতিক উন্নতির শিখরে আরোহন করেছিলেন।

শিল্পকলা সেসময় এমনভাবে বিকাশলাভ করে যা পূর্বে দেখা যায়নি : ভাস্কর্যে গান্ধার ও মথুরা রীতি (লক্ষণীয় যে এই দুটি অঞ্চল তৎকালীন বাণিজ্যপথের দুই প্রান্তে অবস্থিত) এবং স্থাপত্যে সাঁচি ও ভারহুত রীতির উত্থান এযুগেই ঘটেছিল। প্রচুর সংখ্যক শিলালিপি ও মুদ্রার প্রচলন হওয়াতে শিল্প-প্রচেষ্টার বহু নিদর্শন আমরা পেয়েছি। এযুগের সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যকর্মের সাক্ষ্য থেকে এই তথ্য পরিস্ফুট হয়েছে যে গণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসাবিদ্যা সেসময় গভীরভাবে অনুশীলিত

হত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইযুগে যেমন বহু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমত বিধিবদ্ধ হয়েছিল, তেমনি ভারতবর্ষে, দুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারত এবং রামায়ণ এ-যুগেই রচিত হয়। তাছাড়া ভাসের নাটকগুলি এবং অশ্বঘোষের রচনাবলীও এযুগে প্রণীত হয়ে সাহিত্যের রচনাশৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে প্রধান দিকপরিবর্তনের সূচনা করে—এদের মধ্যে আমরা পরিণত ধ্রুপদী শৈলীর সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন দেখতে পাই। ‘ললিতবিস্তর’’ এবং কিছু পরবর্তীকালের ‘বুদ্ধরচিত’, এ গ্রন্থদুটি একটি নূতন সাহিত্য-ধারার সূত্রপাত করে–লোকত্রাতা দেবতার জীবনকাহিনী পরবর্তী যুগে একটি নূতন ধর্মীয় সাহিত্যর শ্রেণী পরিচয় আমাদের নিকট পরিস্ফুট করে তোলে। এই শ্রেণীর বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায় পুরাণ সাহিত্যেযেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও নির্দিষ্ট ধর্মচর্যা বা সম্প্রদায়ের বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও অবতার বা দেবতার জীবন ও কীর্তি কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

এইযুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মে আমরা লোকায়াত ধর্মের সঙ্গে অনেক বেশিমাত্রায় ও অধিকতর মৌলিক ক্ষেত্রে সমঝোতার একটি প্রক্রিয়া লক্ষ করি। দীর্ঘকাল থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর চাপ অব্যাহত ছিল। এমনকি আর্যরা যখন তাদের অপরিশীলিত ও প্রাথমিক যজ্ঞগুলি নিয়ে এদেশে এসেছিল, তখন বিবিধ প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে-বীরে গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাই ঋগ্বেদেও আমরা ইন্দ্র কর্তৃক শলাবৃকদের কাছে যতিদের সমর্পণ করাব বৃত্তান্ত, মুনিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং মৃত বৈখানসদের পুনরুজজীবনের কাহিনী পাই। বিভিন্ন তপস্বী সম্প্রদায়রূপে এইসব গোষ্ঠী। পরবর্তী যুগে আত্মপ্রকাশ করে এবং ফলে দেশীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ধর্মের দ্বারা আর্য উপাসনা পদ্ধতি সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে; খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও গু হ পর্যময় হয়ে ওঠে কেননা সেসময় এধরনের বহু ধর্মগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের বিপুলসংখ্যক অনুগামী ছিল। এরা যজ্ঞধর্মের মৌলিক আদর্শগুলিকে এমনভাবে প্রত্যাহ্বান জানিয়েছিল যে

ব্রাহ্মণঃ ধর্ম সত্যই যুগান্তরে উপনীত হয়ে সার্বিক বিলুপ্তির আশঙ্কার মুখোমুখী হল। পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে আরণ্যকগুলি আধ্যাত্মিক ও অধ্যাত্মবাদী প্রতীকায়নের সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির পুনর্বিশ্লেষণ করে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের আয়ুষ্কালকে দীর্ঘতর, করতে চেয়েছিল। এতে যে নুতন পথ উন্মুক্ত হল, সেদিকে অগ্রসর হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আরও কিছুকাল বেঁচে থাকল বটে–কিন্তু এরই মধ্যে যজ্ঞের মৃত্যুনির্দেশ উত্থান ও প্রাচীনতর পুরাণসাহিত্যের উদ্ভলো ে ব মধ্যবর্তী সময়টা ছিল অচলাবস্থা, অবক্ষয় ও ক্রমাবলুপ্তির যুগ। অবশ্য যজ্ঞ তখনও অনুষ্ঠিত হচ্ছিল কেননা রাজারা ও রাজন্যরা তখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করার মত সমৃদ্ধিশালী ছিল; যদিও অনুষ্ঠান ততদিনে তার জীবনীশক্তি হাবিয়ে ফেলেছে।

এই শতাব্দীগুলিতে যজ্ঞ আরও কৃত্রিম, যান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল, এবং উত্তর ভারতের সর্বত্র উদ্ভূত অসংখ্য নগররাষ্ট্রের রাজসভাগুলিতে বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষকের সামাজিক মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ দূর থেকে যজ্ঞের জাঁকজমক দেখে কৌতুহল বোধ করত। কিন্তু সংশয়, অবিশ্বাস এবং ব্যয়বহুল যজ্ঞসম্পাদনে নিজেদের অক্ষমতা-হেতু ক্রমশ এই ধর্মপ্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরাসক্ত দর্শক ও সমালোচকে পরিণত হয়েছিল। এই জনসাধারণ যেমন সক্রিয়ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত না তেমনি সেযুগে প্রচলিত বিমূর্ত অধ্যাত্মবাদী আলোচনা সম্পর্কেও কোনও প্রকৃত আগ্রহ বা অনুশীলনের ক্ষমতাও তাদের ছিল না। ফলে তারা লঘু ঐতিহ্যের অন্তর্গত লোকায়ত ধর্মের সেই উপাদানগুলির প্রতিই ক্রমশ অধিকতর আকৃষ্ট হচ্ছিল যা তাদেরকে কিছু কিছু আত্মিক আশ্রয়ের সন্ধান দিয়ে পার্থিব সমৃদ্ধির প্রত্যাশা এবং মৃত্যুর পর স্বর্গের আশ্বাস দিতে পারত। এটা নিশ্চয়ই অলস অনুমান নয় যে, যখন দেহান্তরবাদ সাধারণভাবে গৃহীত হওয়ায় এর মূল তত্ত্বগুলি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল–সাধারণ

মানুষ তখন একে অবিমিশ্র অকল্যাণ বলে মনে করেনি। মানুষের অন্তর্গূঢ় জীবনমুখী প্রত্যয় স্বভাবত বারংবার জীবনলাভের প্রত্যাশায় উৎসুক বোধ করবেই, এজীবনে যে-সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়নি, পরবর্তী সুযোগে তা আরও পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার জন্য মানুষ পুনর্জীবনলাভের আশাই আঁকড়ে ধরেছিল। লোকায়ত ধর্ম সাধারণ মানুষের কাছে তারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাই সমাজে তখন যে সংশ্লেষণী প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হল, ক্রমশ পরবর্তী কয়েকটি শতাব্দীতে পরিপূর্ণতা লাভ করে তা পৌরাণিক হিন্দুধর্মে পর্যবসিত হল। অবশ্য এই পর্যায়ে তা নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল : যজ্ঞধর্মের পুরোনো কাঠামো রক্ষিত হয়েছিল কেননা কলোত্তীর্ণ ও পরিচিত কাঠামো হিসাবে সমাজ তাকে উত্তরাধিকাররূপে পেয়েছে। যদিও এরমধ্যে নুতন ভাববস্তু সর্বদাই সংযোজিত হচ্ছিল।

মহাকাব্যগুলিতে এই সামাজিক পরিস্থিতি অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে রাজারা তাদের রাজনৈতিক জীবনের সমস্যা-সঙ্কুল সন্ধিক্ষণে কিছু কিছু যজ্ঞ তখনও অনুষ্ঠান করে চলেছেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী পাবার আশায় পুত্রেষ্টি, স্বজনহত্যার পাপমোচনের জন্য অশ্বমেধ বা যুদ্ধজয়ের জন্য নূতন ধরনের যজ্ঞ (নিকুম্ভিলা) অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কিন্তু তখনকার সমাজে এর মধ্যেই পূজার প্রচলন হয়ে গেছে, তাছাড়া তীর্থযাত্রা, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার, দেবতাদের লীলা, ব্রতপালন, প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা, মন্দির-নির্মাণ ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। পরিত্রাতা দেবতা এবং তাঁদের পূজা প্রায়ই বিবৃত হয়েছে। স্পষ্টত সমাজ ইতোমধ্যে বিশেষ এক মিশ্র ধর্মচিন্তার পথে অগ্রসর হয়ে গেছে; বৈদিক মন্ত্র অবৈদিক অনুষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত হচ্ছে যাতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে একধরনের আপাত ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকে। তবে ধর্মের বিষয়বস্তু ইতোমধ্যে সম্পূর্ণভাবে যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে।

এই যুগেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম তার শেষ সংকটের সম্মুখীন হয়; যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ অবলুপ্তির আশঙ্কার মুখোমুখি এসে এবং অন্যদিকে নব্য হিন্দুধর্মের আসন্ন উত্থানের পূর্বাভাস সূচনা করে তা অতীত ঐতিহ্যের বিনাশ সম্ভাবনার সম্মুখীন হল। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি প্রথম পর্যায়ের প্রত্যাহ্বানের উত্তর যেমন উপনিষদ সাহিত্যে পাওয়া গিয়েছিল, তেমনি তার শেষ পর্যায়ের সংকটের সমাধান পাওয়া গেল বেদাঙ্গগুলিতে। এমন এক সময় এরা বৈদিক সাহিত্যকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছিল যখন তা দ্রুত প্রকৃত অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বেদাঙ্গ পর্যায়ে বহু ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ের অনুশীলনের সূত্রপাত হয়, তাই ব্যাকরণ জ্যামিতি ও ছন্দ যজ্ঞের প্রয়োজনে উদ্ভূত হলেও অতি শীঘ্রই এগুলি আপন অধিকারে স্বতন্ত্র বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও ক্রমাগত অনুশীলনের দ্বারা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

আঙ্গিক ও ভাষা (বেদাঙ্গসূত্র)

সংহিতা-সাহিত্যের অধিকাংশই পদ্যে ও ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত; আবার আরণ্যক ও উপনিষদ সাহিত্যে গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সমগ্র সূত্র-সাহিত্য একটি বিচিত্র ধরনের জটিল, সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ ভাষায় রচিত হয়েছিল। সূত্রের গদ্য সম্পূর্ণত স্বরন্যাস থেকে মুক্ত হলেও এর ব্যাকরণগত কাঠামো ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অনুরূপ; অবশ্য প্রাচীনতর সূত্রগুলিতে বাকসংযমের প্রবণতা অনেক বেশি। এতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে ছয় বা সাতশ বছরের মধ্যে মৌখিক গদ্যে কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। সাধারণভাবে এ ভাষা উপনিষদ ও তৎপরবর্তী যুগের বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত বহন করে। শব্দভাণ্ডারে মহাকাব্যিক যুগের লক্ষণ পরিস্ফুট হলেও এর বিপুল অংশ ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষায় তখনই অপ্রচলিত

হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাকরণ প্রাকপাণিনীয়। সূত্রসাহিত্য মহাভারত সম্পর্কে অবহিত ছিল। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ‘ভারত’ ও ‘মহাভারতে’র উল্লেখ করায় মনে হয়, মহাকাব্য রচনার তিনটি মুখ্য দুটির স্তরের সঙ্গেই তা পরিচিত ছিল।

শব্দসংক্ষেপের জন্য লেখকের অতিরিক্ত উদ্বেগ ছিল বলে ক্রিয়া, সর্বনাম, সম্পূরক শব্দ এবং সমস্ত ধরনের বর্জনীয় ক্রিয়াবিশেষণ ও বিশেষণ পরিত্যক্ত হয়েছিল। ফলে যে কর্কশ, সংক্ষিপ্ত ও সাংকেতিক ভাষার সৃষ্টি হল, অনেকসময়েই উপযুক্ত ভাষ্য ব্যতীত তার অর্থবাোধ প্রায় অসম্ভব। প্রাথমিকভাবে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পর্কিত নির্দেশ শিক্ষকরা মৌখিকভাবে দিতেন। বস্তুত, সূত্রসাহিত্যের অধিকাংশ রচনা এমন একটি যুগে উদ্ভূত হয়েছিল যখন লেখন-প্রণালী আবিষ্কৃত হলেও ধর্মীয় সাহিত্যের প্রয়োজনে তা তখনো ব্যবহৃত হত না। এবং এই সাহিত্য যে-তিনটি উষ্চতর বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তারা মনে করতেন যে এধরনের সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় নিগূঢ় রহস্যময় চরিত্র লেখন-পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে বিপন্ন হবে। সুতরাং নুতন যুগের সাহিত্যও স্মৃতিতে ধারণ করার জন্য প্রস্তুত করা হল। কিন্তু বিষয়বস্তু স্বভাবত শুষ্ক ও বন্ধ্যা হওয়ার ফলে স্মৃতিশক্তির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ল। তাই বাধ্য হয়েই ভাষাকে সমস্তকিছু পরিহারযোগ্য উপাদান বর্জন করে কেবলমাত্র সেই অংশটুকু রক্ষা করতে হল। যা বিবক্ষিত বস্তুর সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচিত জনগোষ্ঠীর কাছে অর্থবহ হয়ে উঠবে। এটা যথার্থ যে গদ্যে রচিত ব্রাহ্মণগুলিও স্মৃতিতে ধারণ করা হত; কিন্তু তখন যজ্ঞ অনেক বেশি জীবন্ত ছিল বলে তা সজীবমন ও শক্তিশালী স্মৃতিকে আকর্ষণ করতে সমর্থ ছিল। তাছাড়া সাহিত্যগত ভাবেও ব্রাহ্মণগুলি পরিপূর্ণতর ভাষায় রচিত বলে সহজে স্মরণযোগ্য রচনা ছিল। অন্যদিকে সূত্র-সাহিত্যে দেবকাহিনীর কোনও স্থান ছিল না। যা ব্রাহ্মণসাহিত্যকে বহু ক্ষেত্রে সজীবতা দান করেছে; এমনকি এতে কোনও আলঙ্কারিক সৌষ্ঠব বা

কাব্যগুণও নেই। উপরন্তু এই শুষ্ক ও নির্জীব সাহিত্য মনুষ্যরচিত বলে স্বীকৃত, তাই পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা থেকেও তা পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল। সূত্রসাহিত্য মৌখিকভাবে সম্প্রচারিত হত বলে অধ্যায়ের সমাপ্তি স্পষ্ট কুরার জন্য একটি বিশেষ রীতি অবলম্বিত হত : শেষ সূত্রটি ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে প্রাপ্ত দৃষ্টান্ত অনুযায়ী অধ্যায় বা বিভাগের শেষে একবার পুনরাবৃত্ত হত, এতেই একটি পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ের অবসান সূচিত হত।

শিক্ষা (বেদাঙ্গসূত্র)

আমরা বেদাঙ্গের অধিকতর বিধিবদ্ধ দিকগুলি প্রথমে আলোচনা করছি। এই পর্যায়ে রয়েছে শিক্ষা (ধ্বনিতত্ত্ব), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র) এবং ছন্দ। এদের মধ্যে শিক্ষা আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়, কারণ সর্বাধিক সংখ্যক রচনা শিক্ষা সম্পর্কে প্রণীত হয়েছে।

শিক্ষাবিষয়ক রচনাগুলিতে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষে ধ্বনিতত্ত্ব অনুশীলন সম্পর্কে পরিচয় পাই। ধ্বনি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত উচ্চারণপদ্ধতি, বাকযন্ত্র ও আস্য-প্রয়াস সম্পর্কে শিক্ষা-গ্রন্থগুলি আমাদের অবহিত করে : সংক্ষেপে বলা যায়, বেদমন্ত্র উচ্চারণ প্রশিক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুই এই গ্রন্থের পরিধিভুক্ত। শিক্ষা প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রতিশাখ্য শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর নামকরণেই এই ইঙ্গিত নিহিত যে প্রতিবৈদিক শাখায় পরিশীলিত শিক্ষাগ্রন্থই হল প্রাতিশাখ্য। অবশ্য বিধিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষা বেদাঙ্গের অন্যতম হলেও প্রাতিশাখ্যগুলি এই বৃত্ত-বহির্ভূত; তবে এদের একটিকে অপরটির সাহায্যে ছাড়া আলোচনা করা অসম্ভব।

বহু শিক্ষাগ্রন্থের নাম আমাদের কাছে পৌঁছালেও এসমস্ত রচনাগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। সমস্ত শাখার চালিত সাধারণ শিক্ষাগ্রন্থগুলি হল ‘পাণিনীয়’, ‘সর্বসম্মত’ ও ‘সিদ্ধান্ত’। মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ গানের প্রণালী, সংহিতা পাঠকে পরিশীলিত করে সুর-সমন্বিত করার পদ্ধতি, উচ্চারণ পদ্ধতি এবং গান ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের সহযোগী অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি এইসব গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু। শিক্ষা সংগ্রহ গ্রন্থটি তুলনামূলকভাবে নবীনতর ও বহু বিষয়-সমৃদ্ধ রচনা। এধরনের গ্রন্থগুলি মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ‘পাণিনীয় শিক্ষা’ যথার্থ উচ্চারণ, সন্ধিবিচ্ছেদ ও সংহিতা পাঠে পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রধান বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করেছে। এই গ্রন্থে ব্যাস, নারদ, শৌনক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা উল্লিখিত হয়েছেন। পাণিনির উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রচলিত গ্রন্থটি স্বয়ং পাণিনির দ্বারা রচিত নয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিক্ষাকে অক্ষর, স্বর, সম্বোধনের স্বর-দৈর্ঘ্য, শ্বাসাঘাত, মন্ত্রোচ্চারণ, ও সন্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সবগুলি শিক্ষাগ্রন্থেই এই বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া পাণিনীয়-শিক্ষার মত প্রধান শিক্ষাগুলি বিষয়বস্তুর গভীরে অবগাহন করে পদের উৎস এবং উচ্চারণের মৌখিক কলাকৌশল আলোচনা করেছে কেননা প্রাতিশাখ্যগুলি যেখানে ধ্বনির শ্রবণগত দিক সম্পর্কে উৎসাহী, শিক্ষা যেখানে ধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর্য-প্রযত্ন সম্পর্কে আলোচনা করেছে। প্রাচীনতর বৈদিক সাহিত্যে স্বরন্যাস উচ্চারণের তীব্রতা অনুযায়ী নির্ধারিত হত। কিন্তু কালক্রমে অবৈদিক উচ্চারণ রীতির সঙ্গে নিরন্তর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে তা ধীরে ধীরে ও নিশ্চিতভাবে শ্বাসাঘাতমূলক স্বরন্যাসে বিবর্তিত হয়। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের সময় থেকে এটা বিধিতে পরিণত হয়ে উপনিষদের কাল পর্যন্ত প্রচলিত থাকে।

এছাড়া আমরা অন্য যেসব শিক্ষাগ্রন্থের কথা শুনি, তাদের মধ্যে কেশব, মাধ্যন্দিনীয়, লোমশ ও অমোঘনন্দিনী শুক্লা-যজুর্বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এদের

মধ্যে অমোঘনন্দিনী প্রধানত উচ্চারণবিধি সম্পর্কিত সাতান্নটি শ্লোকে গ্রথিত সংক্ষিপ্ত একটি রচনা; মাধ্যদিনীয়তে রয়েছে সাতাশটি এবং কেশবে মাত্র নয়টি শ্লোক। গার্গ্যাচার্য রচিত লোমশী গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর রচনা; এতে চারটি খণ্ড ও চল্লিশটি শ্লোক রয়েছে।

ভারদ্বাজ, চারায়ণীয়, আরণ্য ও ব্যাসশিক্ষা তৈত্তিরীয় সংহিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একশ তেত্রিশটি শ্লোকে রচিত ভারদ্বাজ গ্রন্থটি একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা যা প্রতিশব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে ও যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে শেখায়। তৈত্তিরীয় সংহিতা পাঠের বিশুদ্ধতা রক্ষাই এর লক্ষ্য। দশটি অধ্যায় ও তিনশ পঁয়ত্রিশটি শ্লোক-সংবলিত চারায়ণীয় একটি দীর্ঘতর রচনা; এর বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে। সন্ধি, সমাস, আবৃত্তির নিয়ম, স্বরন্যাস, যতি, বিভিন্ন পদের দৈর্ঘ্য, ছন্দ ইত্যাদি। বিষয় পরিধির ক্ষেত্রে 'আরণ্য' ক্ষুদ্রতম, কেননা এই গ্রন্থ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের স্বরন্যাসেই সীমাবদ্ধ। এর দাবি হল যে অন্য নীটি শিক্ষাগ্রন্থ থেকে এ-গ্রন্থ তার বিষয়বস্তু আহরণ করেছে। ব্যাসশিক্ষা সম্ভবত প্রাচীনতম এবং তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য নামক গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল। এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি অন্য বহু শিক্ষার তুলনায় বিষয়বস্তুর দিক থেকে ব্যাপকতর।

অথর্ববেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাণ্ডুকী শিক্ষা ষোলটি অধ্যায় ও একশ চুরাশিটি শ্লোকে গ্রথিত দীর্ঘ রচনা; বশিষ্ট-শিক্ষা নামক অতি ক্ষুদ্র রচনাটিতে শুধুমাত্র অক্ষরের দ্বিত্ব বা 'আবৃত্তি' আলোচিত হয়েছে। গদ্যে রচিত আপিশলী শিক্ষায় বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ ও যথার্থ উচ্চারণ ও ধ্বনির উৎপত্তি আলোচিত হয়েছে।

সামবেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারদীয় শিক্ষার দুটি প্রপাঠকের প্রতিটিই আটটি অধ্যায় বিভক্ত। এতে মোট দুশ চল্লিশটি শ্লোক ও কিছু গদ্য-স্তবক রয়েছে;

সামবেদের পাঠকে সুরের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। সামবেদের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাসশিক্ষা দীর্ঘতম শিক্ষাগ্রন্থ, এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির অন্যতম। সামবেদের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এটি তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যকে এত বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছে যে প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত গ্রন্থের একটি ভিন্ন ধরনের পদ্য-সংস্করণ হয়ে পড়েছে। এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে প্রায়োগিক পরিভাষা, স্বরন্যাসের বিধি, দ্বিত্ব-বিধি ইত্যাদি।

অন্যান্য রচনার উল্লেখ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শিক্ষাশ্রেণীভুক্ত সমস্ত গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। এমন প্রায় চৌদ্দটি নাম পাওয়া যায় যা এখন আমাদের নিকট লুপ্ত। পাণিনি তার রচনাকে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং কয়েকটি প্রাচীনতর শ্রৌতসূত্রের প্রয়োগিক দিকের সাহায্যে প্রণয়ন করেছিলেন। সোমশর্মা রচিত 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা'র বিষয়-পরিধি পাণিনীয়ের অনুরূপ; তবে এটা বহু পরবর্তীকালের রচনা-অন্তত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী তো নয়-ই অর্থাৎ যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগে নুতনভাবে যজ্ঞধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়েছিল তখনকার। এর চেয়েও পরবর্তী রচনা হল 'কাত্যায়ন-শিক্ষা' যদিও কোনো কোনো বিখ্যাত গবেষকের মতে এটি যাজ্ঞবল্ক্য শ্রৌতসূত্র অপেক্ষা প্রাচীনতর। যেহেতু প্রথমোক্ত রচনা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি শেষোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে আমাদের মনে হয়, উভয় গ্রন্থই সম্ভবত কোনো বিলুপ্ত প্রাচীনতর রচনা থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে থাকবে। অনুমান করা যায়, কাত্যায়ন-শিক্ষা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। এর শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্য— উভয়ক্ষেত্রে বিষয়সূচী প্রায় এক; তবে প্রথমোক্ত রচনা উচ্চারণ-প্রয়াসের প্রকৃতি সম্পর্কে অধিক মনোযোগী এবং দ্বিতীয়োক্ত রচনায় উচ্চারিত ধ্বনির শাব্দিক চরিত্র আলোচিত। এই দুই শ্রেণীর রচনার প্রকৃত পার্থক্য একটি বিধিতে আভাসিত হয়েছে : যখন শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্য

পরস্পরবিরোধী অভিমতদেয়। তখন প্রতিশাখাই প্রামাণ্য বলে গণ্য হবে; কেননা বৈদিক ধর্ম ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় ফলে বাচনভঙ্গীতে যে বৈচিত্র্য ও উচ্চারণ-বিধিতে যে পরস্পর-বিরোধিতা দেখা দেয়, তার ফলে বহু ভাষাভাষী জনসাধারণের কাছে সর্বজনগ্রাহ্য নির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করা কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রত্যেক অঞ্চল কোনো নির্দিষ্ট শাখার প্রচলিত প্রয়োগ বিধির দ্বারা পরিচালিত হত। কীল্‌হর্ন মনে করেন যে অপেক্ষাকৃত নবীনতর শিক্ষাগুলি বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে প্রাতিশাখ্যের তুলনায় পূর্ণতর ও রচনা-বিন্যাসের ক্ষেত্রে উন্নততর। তবে প্রথম সম্ভবত একটিমাত্র শিক্ষা প্রচলিত ছিল এবং পাণিনির বৈদিক ধ্বনিতত্ত্ব-বিষয়ক প্রাচীন।৩ম রচনাটি ছিল এই শিক্ষা, যা দীর্ঘকাল ধরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয়। লক্ষণীয় যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে 'শিক্ষা' শব্দটি একবচনে প্রযুক্ত হয়েছে; (৭ : ২ : ১); এতে মনে হয় যে এটা শ্রেণীনাম ও সম্ভবত বিভিন্ন শাখায় প্রচলিত বেশ কিছু রচনার সাধারণ নাম। আমাদের কাছে যেসব শিক্ষাগ্রন্থ পৌঁছতে পেরেছে, সেগুলিকে বেদাঙ্গসূত্রের প্রাচীনতম পর্যায়ের কাছাকাছি স্থাপন করতে হবে; কিন্তু 'প্রতিশাখ্যগুলি অন্ততপক্ষে চার বা তিন শতাব্দী পরে রচিত–নবীনতম প্রাতিশাখ্যগুলি সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল।

প্রচলিত প্রতিশাখ্যগুলি মূল শৌনকের ঋক-প্রাতিশাখ্য, যদুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত কাত্যায়ন-রচিত 'বাজসনেয়' প্রতিশ্যাখ্য, অথর্ববেদের অন্তর্গত শৌনক রচিত অথর্ব-প্রতিশাখ্য' বা চতুরধ্যায়িকা, এবং সামলেদের অন্তর্গত সাম-প্রাতিশাখ্য' (পুষ্প বা পঞ্চবিধ সূত্রের মত সংক্ষিপ্ত রচনাগুলিও এর সঙ্গে সংযোজিত)। বহু প্রতিশাখ্য প্রাচীনতর। এবং অঞ্চল ও শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন; এদের মধ্যে থেকেই বিমূর্তায়ন ও সাধারণীকরণের প্রবণতার ফলস্বরূপ শিক্ষাগ্রন্থগুলি উদ্ভূত হয়। উবট ভাষ্যে আমরা এর প্রমাণ পাই যেখানে তিনি বলেছেন যে এই

বিশেষ বেদাঙ্গটি (অর্থাৎ প্রাতিশাখ্য) সমস্ত বেদের শিক্ষা ছন্দ ও ব্যাকরণগুলিতে সাধারণভাবে প্রাপ্ত সূত্রগুলির সংকলন; তাছাড়া কোনও নির্দিষ্ট শাখার প্রয়োগরীতি অনুযায়ী সাধারণ নিয়মগুলি এতে পরিশীলিত হয়েছে বলেই এধরনের রচনাকে প্রাতিশাখ্য' বলা হয়। খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঋক প্রাতিশাখ্য নিজেকে বেদাঙ্গরূপে বর্ণনা করেছে (১৬ : ৬৯); যদিও পরিচিত তালিকাগুলি শিক্ষাকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে। কারণ সম্ভবত প্রতিশাখা থেকে শিক্ষা গঠিত হওয়ার পরই সেই তালিকা সংকলিত হয়েছিল। উবট প্রাতিশাখ্য তালিকায় শিক্ষাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং শেষোক্ত রচনাগুলিকে তিনি 'পার্ষদ' বা বিদ্বজনমণ্ডলীরূপে অভিহিত করেছেন। শৌনকের ঋক-প্রতিশ্যাখ্য শাকিল শাখার অন্তর্গত, এর আঠারটি 'পটল' দুটি প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমভাগে রয়েছে। বর্ণমালাসম্পর্কিত একটি অধ্যায় যাকে ধ্বনিগত উৎস অনুযায়ী কয়েকটি সমরূপযুক্ত ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে (১ম পটল); এছাড়া রয়েছে চোদ্দ রকম সন্ধি ও সন্ধি-প্রতিষেধ (২য়) এবং বিভিন্ন ধরনের আলোচনা-সংবলিত আরো চারটি অধ্যায়। দ্বিতীয় ভাগে যে বারোটি পটল (অধ্যায়) রয়েছে, তার মধ্যে দীর্ঘায়িত স্বরবর্ণ (৭ম), পুতস্বরের বৈচিত্র্য (৮ম ও ৯ম), স্মৃতিতে ধারণ করার জন্য ক্রম-পদ্ধতি (১০ম ও ১১শ), ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ (১৪শ), ছাত্রদের শিক্ষাদান করার উপায় (১৫শ) ও ছন্দ (১৬শ) ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে প্রকৃতপক্ষে একই বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে; এছাড়া বিভিন্ন প্রায়োগিক পরিভাষাও আলোচিত হয়েছে।

কাত্যায়নের শুক্ল-যজুর্বেদ-প্রতিশাখ্য গ্রন্থে আটটি অধ্যায় ও সাতশ' সাতাশটি সূত্র রয়েছে। এতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে : সামবেদীয় ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ, শিক্ষকদের দ্বারা নির্দেশিত আবৃত্তির বিচিত্র প্রাচ্যরীতি, শুক্ল যজুর্বেদের পদ ও ক্রমপাঠ, সন্ধিবিধি, স্বরন্যাস,

আবৃত্তির জন্য কন্ঠস্বরের পরিবর্তন, বিভিন্ন জটিল পাঠে প্রতিটি শব্দ পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি ইত্যাদি।

আমরা শুক্ল যদুর্বেদের পনেরোটি ভিন্ন শাখার কথা শুনি, এদের সবগুলি একটিমাত্র সাধারণ প্রতিশ্যাখ্য ছিল। ঋকপ্রাতিশাখ্যে ছন্দ আলোচিত হলেও শুক্ল যজুর্বেদ-প্রতিশাখ্যে তা হয় নি-সম্ভবত এর কারণ এই যে, প্রাতিশাখ্যরচয়িতা কাত্যায়ন তার সর্বানুক্রমণী গ্রন্থে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। বিশেষভাবে শুক্ল যজুর্বেদের সঙ্গে সম্পর্কিত ধ্বনিতত্ত্ব এই গ্রন্থে আলোচিত হলেও বহু আপাত অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এতে সন্নিবেশিত হয়েছে; যেমন-স্মৃতি-নিবদ্ধ করার প্রয়োজন বা বেদাধ্যয়নের নির্দেশ বা সাঙ্গীতিক প্রণালী বা কিছু কিছু প্রাচীন আচার্য ও তাদের অনুসরণকারীদের বিচিত্র আবৃত্তিরীতি। শুক্লযজুর্বেদ প্রাতিশাখ্য অনুযায়ী বর্ণমালায় ৬৫টি বর্ণ রয়েছে—কেননা উচ্চারণের বিভিন্ন সূক্ষ্ম তারতম্যও এতে স্বীকৃত; এছাড়া আছে। ফলশ্রুতি অংশ, যেখানে আলোচ্য গ্রন্থপাঠ-লব্ধ পুণ্যসমূহ বিবৃত হয়েছে।

সর্বাধিক-সংখ্যক প্রতিশাখ্য সামবেদের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট; এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত হল সাম-প্রতিশ্যাখ্য, ‘পঞ্চবিধ’’ বা ‘পুষ্পসূত্র’ ও ঋকতন্ত্র। ঋকতন্ত্র গ্রন্থটি মূলত ব্যাকরণের প্রকৃতি যুক্ত; অন্যান্য রচনাগুলিতে সামবেদের আবৃত্তি ও গানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের বিশেষ পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন শাখা ও অঞ্চলভেদে গায়নরীতি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তিত হতে পারে; এই রচনাসমূহে পরিবর্তন-সম্পর্কিত নিয়মাবলী দেওয়া হয়েছে। তাই সামবেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাতিশাখ্যের এত সংখ্যাধিক্য।

সামবেদের প্রাতিশাখ্যগুলি সম্ভবত অথর্ববেদীয় প্রতিশ্যাখ্য অপেক্ষাও প্রাচীনতর।; শেষোক্ত রচনাগুলিতে প্রকৃতপক্ষে সূত্রসাহিত্যের উন্মেষপর্বের

বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে অথর্ববেদের তিনটি প্রাতিশাখের মধ্যে মাত্র একটি, অথর্ব। প্রতিশ্যাখ্য নামে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অন্য একটি, কৌণক ও সায়ণ শাখার রচনা 'চতুরধ্যায়' নামে পরিচিত; পৈপ্পলাদ শাখার তৃতীয় প্রাতিশাখ্যটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। চতুরধ্যায় ও অথর্ব প্রাতিশাখ্যের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। এর বিষয়বস্তু অন্যান্য প্রাতিশাখ্যগুলির প্রায় অনুরূপ। কিন্তু যেহেতু অন্যান্য পরিচিত সংহিতাগুলির

প্রাতিশাখ্যের অতিরিক্ত গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে। কারণ তা এমন একটি দুর্জেয় ভাষার উপর আলোকসম্পাত করেছে যার মধ্যে একই সঙ্গে ঋকবেদ ও যজুর্বেদ সংহিতা প্রাচীনতর ও নবীনতর—এই উভয়বিধ নিদর্শনই সংরক্ষিত আছে। এর অন্য বৈশিষ্ট্য হল লেখনপ্রণালীর প্রতি গুরুত্ব আরোপের প্রবণতা; এই অসামান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য একে স্পষ্টত সেই সময়ের রচনা বলে চিহ্নিত করা চলে যখন বৈদিক সাহিত্য লিখিত রূপ পরিগ্রহ করছিল। পাণিনি ও পতঞ্জলির আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে-সম্ভবত শেষোক্ত জনেরই বেশি কাছাকাছি-এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছিল। 'চতুরধ্যায়'–প্রচলিত অথর্ববেদ পাঠকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছে। যদিও কখনো কখনো স্পষ্টতই তা ত্রুটিপূর্ণ। লক্ষণীয় যে, প্রতিশাখ্যের বিষয়বস্তুর মতে, এমন কিছু রয়েছে সাধারণত যাকে ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; এদের বিষয়বস্তু প্রায়ই পরস্পরের বৃত্তে অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু প্রাতিশাখাগুলি কখনো ব্যাকরণ বলে' অভিহিত হয় না, কারণ ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষাদান এগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, বিভিন্ন বৈদিক শাখার নির্ভুল প্রকরণ বিবৃত করাই এদের লক্ষ্য। অবশ্য এদের মধ্যে স্পষ্টভাবে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যাকরণের অস্তিত্ব ও পরিশীলন সূচিত হয়; এই সঙ্গে দুটি স্পষ্টত ভিন্ন ধারায় এদের বর্গীকরণের পূর্বাভাসও পাওয়া যায়। প্রাতিশাখাগুলিতে ভাষা অধিক তরল্যায়িত; উষ্চারণ, স্বরভঙ্গি, সন্ধি ও

স্বরন্যাসের অসংখ্য আঞ্চলিক বিকল্প কাে‌প প্রকাশিত হয়েছে। পৃথক বিষয়-রূপে ব্যাকরণের উদ্ভবের ফলে এগুলি আরো কঠোরভাবে বিধিবদ্ধ হয়েছিল।

পদপাঠের প্রণেতা শাকল্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে যাস্ক বা শৌনক অপেক্ষা প্রাচীনতর। পদপাঠ ছাড়াও সংহিতাকে স্মৃতিতে ধারণ করার জন্য অন্যান্য পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল; যেমন–জটা, মালা, রথ, ধ্বজ, ঘন, রেখা, শিখা ও দণ্ড। সংহিতাপাঠের যথাযথ পৌর্বাপর্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিভিন্ন পারস্পর্যে সংহিতার শব্দসমূহ প্রাগুক্ত স্মৃতিসহায়ক পদ্ধতি অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হত।

ব্যাকরণ (বেদাঙ্গসূত্র)

অধ্যয়নের বিষয়রূপে ব্যাকরণ নিশ্চিতই দীর্ঘকাল ধরে বহু গবেষক দ্বারা অনুশীলিত হচ্ছিল—প্রাচীন বিশেষজ্ঞদের অভিমত বিভিন্ন বেদাঙ্গে বহুবার উল্লিখিত হওয়ার মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবু একমাত্র পাণিনির বৈদিক ব্যাকরণটিই আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে, তাও আবার ধ্রুপদী ব্যাকরণ-বিষয়ক রচনার বৈদিক ব্যাকরণ-সংক্রান্ত বিষয় একটিমাত্র অধ্যায়েই নিহিত। এখানে পাণিনি ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষার অপ্রচলিত স্বরন্যাস এবং প্রাচীনতর ভাষার বিচিত্র ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রণীত এই রচনায় ভাষা-আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায়, কেননা বৈদিক ভাষা ততদিনে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে; দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা এবং সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের উপভাষা ও ধ্রুপদী প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বৈদিক ভাষার বিকল্প হয়ে উঠেছিল।

পাণিনির দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অতুলনীয় এবং সম্পূর্ণত বৈজ্ঞানিক। বৈদিক অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত; ধ্রুপদী ভাষার অধ্যায়ে প্রযুক্ত পারিভাষিক শব্দ এখানেও ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া ধ্রুপদী ভাষা সম্পর্কে সচেতনতার আভাস এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়টিতে পরিস্ফুট। আরো পরবর্তীকালে পতঞ্জলি বৈদিক ভাষাকে 'ছন্দঃ' এবং কথ্য ভাষাকে 'লৌকিক' বা 'ভাষা' নামে অভিহিত করেছেন। পাণিনির মৌলিক অবদান সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা সহজ নয় কারণ তাঁর পূর্বসূরীদের রচনার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির ফলে (এদের মধ্যে অনেকের নাম পাণিনি তার ব্যাকরণে উল্লেখ করেছেন)। আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না ব্যাকরণের কী কী ধারণা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছিলেন আর কোন অংশ তার নিজস্ব উদ্ভাবন। তবে মনে হয় প্রত্যয় ও বিভক্তির মতো পারিভাষিক শব্দ এবং বর্ণমালা-সংক্রান্ত প্রাথমিক নিয়মাবলী যেমন শিবসূত্র, গণ ইত্যাদি সম্ভবত পাণিনির নিজস্ব অবদান। পাণিনি স্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা ও দ্ব্যর্থবিহীনতার পক্ষপাতী; তাঁর সমগ্র ব্যাকরণ-প্রকরণে এই পূর্বানুমান আভাসিত যে সাহিত্য শ্রীতি-সঞ্চরণের উপর নির্ভরশীল। যদিও ততদিনে লিখন-প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হয়ে গেছে। চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ততার আদর্শরূপে তার ব্যাকরণ সেই সূত্র-শৈলীর চমৎকার নিদর্শন যেখানে একটি বাহুল্য অক্ষরও বর্জিত হয়ে থাকে। যে যুগে সংস্কৃত আর কথ্য ভাষা ছিল না, সেই সময়েই পাণিনি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, তাই তিনি প্রচলিত শব্দভাণ্ডারকে ব্যাপকভাবে অনুশীলন করেছিলেন, এতে অনুমান করা যায় যে ইতোমধ্যে সংস্কৃত মৃত ভাষা হয়ে পড়েছিল। বিখ্যাত গবেষক টি. বারো দেখিয়েছেন যে পাণিনির প্রচেষ্টায় সংস্কৃত ভাষা তৎকালে প্রচলিত রূপে চূড়ান্ত স্থিতিশীলতা অর্জন করেছিল। অন্যভাবে বলা যায়, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর এই বৈয়াকরণের আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; কেননা তার রচনা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে জলবিভাজন রেখারূপে বর্তমান। তৎকালীন ভাষাতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষাটি ছিল জটিল, যেহেতু তখন বৈদিক, প্রত্ন-

ধ্রুপদী সংস্কৃত ও কথ্য উপভাষাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সহাবস্থান করছিল। কিন্তু মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও দুই সহস্রাব্দের বেশি কাল ধরে সংস্কৃত ও কথ্য উপভাষাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সহস্রাব্দের বেশি কাল ধরে সংস্কৃত ভাষা বিদ্বদ্বত্তার একমাত্র মাধ্যম হয়ে রইল; পাণিনির ব্যাকরণ দ্বারা কঠোরভাবে তা নিয়ন্ত্রিত হত। তাই ভারতীয় বিদ্বৎসমাজে পাণিনির সম্মানিত প্রতিষ্ঠা অবিসম্বাদিত।

শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্য, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে যে বৈদিক ভাষা কালক্রমে অপরিচিত ও বিরল হয়ে পড়েছিল। বস্তুত খ্রিস্টপূর্ব অষ্ট শতাব্দীতে বৈদিক ভাষা যেহেতু বিশেষ সহায়ক ব্যতীত দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে তাই কতকটা অনিবার্যভাবেই একটি পবিত্রতার ধারণা যুক্ত হয়ে পড়ল। শুধুমাত্র বৃত্তিধারী পুরোহিত ও শিক্ষকদের কাছেই ঐ ভাষা বোধগম্য ছিল। এই বিশেষ ভাষাগত পরিপ্রেক্ষিতে–পবিত্রীভূত বৈদিক সাহিত্যের ভাষা থেকে যখন কথ্যভাষার কিছু কিছু অনুপুঙ্খ স্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে পড়েছিল তখন শিক্ষা, ব্যাকরণ প্রভৃতির উত্থান ঘটায় এদের চরিত্রবৈশিষ্ট্যে ঐ পরিপ্রেক্ষা ধরা পড়েছিল। শিক্ষাগ্রন্থগুলিতে এমন অনেক কিছু পাওয়া যায় যা ইতোপূর্বে প্রাতিশাখ্যগুলিতে বিবৃত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত রচনাগুলিতে যেহেতু এমন অনেক নিয়ম ছিল যাদের সঙ্গে বেদমন্ত্র আবৃত্তিকারীদের কোনো সম্পর্ক ছিল না-বেদমন্ত্র বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করার জন্য উপযুক্ত বিধিসম্বলিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন তাই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। ঐসব বিধিকে একই সঙ্গে বোধগম্য ও সহজে স্মরণযোগ্য আঙ্গিকে সন্নিবেশিত করার জন্যই "শিক্ষাগুলি রচিত হল; যখন বেদমন্ত্রের আবৃত্তি এত কৃত্রিম হয়ে পড়ল যে অপেক্ষাকৃত সরল প্রাতিশাখের নিয়মের সাহায্যে তাদের যথাযথ ব্যাখ্যাদান আর সম্ভব হল না–সে সময়ে এ-ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন আরো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো। তাছাড়া প্রতিবেশী ভাষা অর্থাৎ অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাবে পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা আরো বেশি রূপান্তরিত হলো। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষা উদ্ভূত হয়েছিল এবং পরবর্তী শতাব্দী থেকে বৌদ্ধ সাহিত্য ক্রমশ অধিক মাত্রায় পালি ভাষায় রচিত হতে থাকে। এমন কি, ঋগ্বেদেও প্রাকৃত ভাষার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়; খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে অথর্ববেদ চতুর্থ বেদরূপে স্বীকৃতিলাভের পরে ধর্মগ্রন্থের শব্দভাণ্ডারে বহু লোকায়ত ও আঞ্চলিক ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান প্রবিষ্ট হতে থাকে।

গ্রিক, শক, কুষাণ, হূন প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির আক্রমণের পরে উচ্চারণ ও স্বরভঙ্গির ক্ষেত্রে সংশয় যেমন বহুগুণ বর্ধিত হলো, তেমনি স্বরন্যাসের চরিত্রও আমূল পালটে গেল। পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত জনসাধারণের পাশাপাশি বসতি করে নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করল। এই পরিস্থিতির সুদূরপ্রসারী পরিণতি দেখা গেল প্রাচীন ভারতীয় আর্যের বৈদিক ভাষা যা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সীমাবদ্ধ অধিকারে পর্যবসিত হল। এরা বিভিন্ন কৌম ও গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন (যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট কৌমের প্রতি তারা আনুগত্য প্রকাশ করতেন না)। প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক আর্যভাষায় ব্রাহ্মণরা তাদের ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করলেও এটা ছিল সেই সময় (৫০০-২০০ খ্রিস্টপূর্ব) যখন বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার ফলে বৈদিক ধর্ম ও তদনুগামী ভাষার মহিমা ক্রমশ খর্ব হয়ে পড়েছিল। এই ভাষাগত সংশয়দীর্ণ জটিলতার পরিবেশে পুরোহিত সম্প্রদায়কে তঁদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণের দুরূহ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। কিন্তু কঠোর ধর্মচর্যা ও প্রয়োজনীয় ভাষাগত প্রশিক্ষণের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান অনীহার ফলে ভাষার ক্ষেত্রে সমস্যা নিশ্চিতই প্রবল সংকট সৃষ্টি করেছিল। পবিত্র বৈদিক সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষার ক্ষেত্রে সংকট-সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে পুরোহিতরা সংরক্ষিত ঐতিহ্যকে বিধিবদ্ধ

করার জন্য যত্নবান হয়ে উঠেছিলেন; আঞ্চলিক রূপভেদকে তারা স্বাভাবিক ও কখনো কখনো অনুমোদনযোগ্য বিকল্প হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন।

প্রাচীন বিশেষজ্ঞদের নামোল্লেখ (যাঁদের রচনা আমাদের কাছে পৌঁছয় নি) প্রমাণিত করে যে বৈদিক সাহিত্যের অন্তিম পর্যায়ের সময় থেকে কথ্যভাষা ক্রমাগত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে দূরে সরে যাওয়ায় শেষোক্ত ভাষা অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে; যে-সমস্ত বিশেষজ্ঞের তত্ত্ব উপযুক্ত নমনীয়তা ও ব্যাপকতার জন্যে নিজেদের চিন্তাধারায় বিভিন্ন ভাষাগত রূপান্তরকে যথাযথ স্থান দিতে পেরেছেশুধুমাত্র সেইসব গ্রন্থই নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। দ্ব্যর্থবিহীন স্পষ্টতার প্রয়োজনে সৃষ্ট সামঞ্জস্যবিধানের প্রবণতা বিভিন্ন প্রতিশাখ্যে বিশেষজ্ঞের অভিমত দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। তাই যদিও আমরা প্রতি বেদের অনেক শাখা, এমনকি অনেক প্রাতিশাখের কথাও শুনি, প্রতি বেদের জন্য একটিমাত্র প্রাতিশাখ্যই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। সংক্ষেপে বলা যায়–বৈদিক আবৃত্তি নিয়ন্ত্রণকারী ভাষাবিষয়ক নিয়মাবলী সূত্রে পরিণত হওয়া অনিবার্য; তাই এ ধরনের নূতন অর্ধ লোকায়ত পদ্ধতির উদ্ভব ও বেদাঙ্গরূপে তাদের স্বীকৃতিলাভ সম্ভব হল।

নিরুক্ত (বেদাঙ্গসূত্র)

যাস্কের নিরুক্তই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে পৃথিবীর প্রথমতম গ্রন্থ। পণ্ডিতগণ এর রচনাকাল সম্পর্কে একমত হয়ে খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ থেকে ৫০০ অব্দের মধ্যে এর সময় নির্দেশ করেছেন যদিও খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি একে সংস্থাপিত করাই অধিক সম্ভব বলে মনে হয়। নিরুক্ত তিনটি কাণ্ড ও পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। নৈঘণ্টুক কাণ্ডরূপে পরিচিত প্রথম তিনটি অধ্যায়ে

প্রতিশব্দ; নৈগম কাণ্ড বা ঐকপাদিকরূপে অভিহিত চতুর্থ অধ্যায়ে সমার্থক শব্দ; এবং দৈবত কাণ্ড-রূপে পরিচিত পঞ্চম অধ্যায়ে বৈদিক দেবতাদের নামের ব্যুৎপত্তি আলোচিত হয়েছে। ঐকপদিকে আলোচিত শব্দসমূহের অধিকাংশ ঋগ্বেদের চূড়ান্ত পর্যায়ের রচনা থেকে সংগৃহীত। নৈঘন্টুকের তিনটি অধ্যায়ের প্রথমটিতে বায়ু, জল, পৃথিবী ইত্যাদির মতো ভৌত উপাদান; দ্বিতীয়ে মানুষ, তার দেহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আবেগ ইত্যাদি এবং তৃতীয় মূলত দেবতা ও তৎসংসৃষ্ট কিছু বিমূর্ত ধারণাসমূহ আলোচিত হয়েছে। নিরুক্তের দুটি অর্ধে মোট বারোটি পরিচ্ছেদ আছে; প্রথম ছটি পরিচ্ছেদে নিঘণ্টর প্রথম দুটি কাণ্ড এবং শেষের ছ'টি পারচ্ছেদে দৈবত কাণ্ড ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রতি অর্ধে মৌলিক বিধি ও আলোচ্য বিষয়ের পরিধি সম্পর্কে সাধারণ ভূমিকা রয়েছে; সম্ভবত তাতে রচনার দুটি স্তরের মধ্যবর্তী ব্যবধান আভাসিত।

ব্যাকরণ ব্যুৎপত্তির কাঠামোও আঙ্গিকগত দিক সম্পর্কে নিরুক্ত অবহিত, অন্যদিকে শব্দের অর্থান্তর-সংক্রমণের তত্ত্বও বিশ্লেষণ করেছে। বহুলাংশে কাল্পনিক এবং অবাস্তব হলেও ব্যুৎপত্তি ব্রাহ্মণ সাহিত্যে এবং নিতান্ত প্রাথমিক রূপে ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। যাস্ক তার গ্রন্থে অন্তত ষোলজন পূর্বসূরী শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের অভিমত উল্লেখ করেছেন। এতে মনে হয়, যাস্কের কয়েক শতাব্দী পূর্বেও সম্ভবত ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র অনুশীলিত হত। আমরা দেখেছি যে ছদ্মযুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তিতে শব্দের অর্থসংক্রমণগত উৎস নির্ধারণের প্রথম অনুমাননির্ভর প্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে। যাস্ক তার পূর্বসূরী হিসাবে সংহিতা (সবগুলি শাখায় বিন্যস্ত রূপে), ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও প্রাতিশাখাগুলিকে পেয়েছিলেন। এসব রচনা থেকে তিনি উপাদান আহরণ করেছিলেন এবং এগুলির উপর ভিত্তি করেই নিজস্ব বক্তব্য শঠন করেছিলেন। সেযুগে বেদাধ্যয়ন যে পরিশীলিত স্তরে উপনীত হয়েছিল, তা বেদ বিষয়ক চিন্তার বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে যাস্কের উল্লেখ থেকে

প্রমাণিত হয় যথা যাজ্ঞিক, বৈয়াকরণ, নৈদান, ঐতিহাসিক ও নিরুক্ত। বৈদিক মন্ত্রগুলিকে যিনি অর্থহীন বলে মনে করতেন, সেই কৌৎসের অভিমত সম্পর্কে নিরুক্তের আলোচনা (১ : ১৫) কিংবা ঐতিহাসিক পক্ষের অস্তিত্ব (৩ : ১২) থেকে প্রমাণিত হয় যে বস্তুবাদী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছিল।

নিরুক্ত গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিলুপ্ত শব্দের তালিকার উপর ভাষ্য; একটি পৃথক শব্দ-তালিকা রূপে যদি কখনো তার অস্তিত্ব থেকে থাকে, ভাষ্যকৃত শব্দগুলি থেকে এখন তার পুননির্মাণ করা যেতে পারে। এই তালিকাকে নিঘন্টু বলা হত; তাই প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে নৈঘন্টক নামটি প্রযুক্ত হয়। মনে হয় যে নিঘন্ট বলতে মূলত প্রতিশব্দ-বিষয়ক গ্রন্থই বোঝাতে; পরবর্তীকালে অভিধারে বৃত্তকে প্রসারিত সমার্থক শব্দ ও দেবনামকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ফলে প্রবলভাবে সীমাবদ্ধ হয়েও যাস্ক নিরুক্তে ব্যুৎপত্তি অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন; তিনি দৃঢ়ভাবে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে শব্দসমূহের নির্বাচন সম্ভব, তবে এই অভিমতের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি উদ্ভট ব্যুৎপত্তির সন্ধান দিয়েছেন। বহুক্ষেত্রে কোনো মূল ধাতু থেকেই ব্যুৎপত্তি সন্ধানের প্রবণতার ফলে তিনি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন; অনুরূপভাবে একটি দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যুৎপত্তি অনুশীলন প্রক্রিয়ার অভাবের ফলে শব্দের বহুমুখী নির্বাচন দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও যাস্ক একটি বিস্ময়কর সতর্ক ও যুক্তিনিষ্ঠ মনের পরিচয় দিতে পেরেছেন; এ ক্ষেত্রে তার অবদানের মূল্য মূলগত নির্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে যেহেতু তিনি বিরোধী পক্ষের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী অভিমতকেও স্বীকৃতি দিতে

ইতস্তত করেন নি। যাস্ক বিশ্বাস করেন যেন ব্যুৎপত্তি কখনোই অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়; কারণ নিছক ব্যাকরণের নিয়ম কোনাে শব্দের উৎস নির্ণয়ে সফল না হলেও শব্দার্থ পরিবর্তনগত অনুষঙ্গকে অবলম্বন করে আমরা সেই শব্দের সম্ভাব্য উৎসস্থলে উপনীত হতে পারি। তাই যাস্ক সর্বদা ব্যুৎপত্তি নির্ণয় প্রক্রিয়াকে শব্দার্থ-পরিবর্তন তত্ত্ব ও শাব্দিক প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

যাস্ক চার ধরনের পদকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন-নাম (বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম, আখ্যাত (ক্রিয়া), উপসর্গ ও নিপাত (অব্যয়); এ আলোচনায় তিনি আশ্চর্য স্পষ্টতা ও বিজ্ঞানসম্মত ঋজুতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনো কখনো যেন সে-সমস্ত ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মের পূর্বাভাস পাওয়া যায়, পাণিনি তার ব্যাকরণে পরবর্তীকালে যেগুলি ব্যবহার করেছিলেন; কখনো বা কোনো ব্যুৎপত্তিতে বহু সম্ভাব্য ধাতুর সম্পর্ক নির্ণয় করে তিনি তার বিষয়বস্তুতে আশ্চর্য অন্তদৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন। তাত্ত্বিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে তিনি বহু ভাষাতাত্ত্বিক প্রবণতাকে উপভাষার প্রভাব ও আঞ্চলিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং তৎপ্রসূত ভাষাগত সংমিশ্রণের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। যেসব ক্ষেত্রে তিনি সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানেও আমাদের বহু ভাষাতাত্ত্বিক প্রবণতাকে উপভাষার প্রভাব ও আঞ্চলিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং তৎপ্রসূত ভাষাগত সংমিশ্রণের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। যেসব ক্ষেত্রে তিনি সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানেও আমাদের বিবেচনার জন্য বহু তাৎপর্যপূর্ণ সূত্র রেখে গেছেন। যাস্ক স্পষ্টতই বহু বৈয়াকরণ ও ব্যুৎপত্তিবিদের দীর্ঘায়িত ঐতিহ্যের পরিণত পর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন; কিন্তু তার নিজস্ব অবদান এত অসামান্য ছিল যে তা পূর্বসূরীদের কীর্তিকে সম্পূর্ণ ম্লান করে দিয়েছিল; নিরুক্তের ভাষার মধ্যে বৈদিক ভাষার বিবর্তনের নিদর্শন স্পষ্ট; তাই যাস্ক বহু বৈদিক শব্দকে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে পরবর্তী ও অধিকতর প্রচলিত রূপের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রের অন্যতম প্রাচীনতর বিশেষজ্ঞ শাকটায়ন মনে করতেন যে সমস্ত বিশেষণকে ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করা সম্ভব। কিন্তু ব্যুৎপত্তিবিদরূপে মাস্ক অষ্টি, এক ভারসাম্য-বোধের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু এ ধরনের চরম অভিমতকে সমর্থন করেন নি। তাছাড়া কৌৎসের বক্তব্যকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেও যে কৌৎস বৈদিক মন্ত্রসমূহককে অর্থহীন বলে ঘোষণা করে মৌলিক প্রতিবাদী চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন-তা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

জ্যোতিষ (বেদাঙ্গসূত্র)

বৈদিক যুগে রচিত জ্যোতিষ-সংক্রান্ত কোনো গ্রন্থ আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় নি; এ-সম্পর্কে যজুর্বেদ একমাত্র উৎস হিসাবে গণ্য। অবশ্য লগধপ্রণীত জ্যোতিষ বেদাঙ্গ বা বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ নামে একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়; এর প্রচলিত দুটি পাঠই পদ্যে বিন্যস্ত। ঋগ্বেদীয় পাঠে ছত্রিশটি এবং যজুর্বেদীয় পাঠে তেতাল্লিশটি শ্লোক পাওয়া যায়। উভয় পাঠেই নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে : উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সময়ে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সঠিক সংশয়, সাতাশটি চান্দ্র আবর্তনের স্থিতি এবং এ-সব গণনার নিয়মাবলী। অবশ্য জ্যোতিবিদ্যা সম্পর্কে এই আগ্রহ তখনো পর্যন্ত বিশুদ্ধ বিদ্যাচর্চার প্রয়াস হয়ে ওঠে নি; যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী যথার্থ সময় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে নক্ষত্রের অবস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এগুলির মধ্যে দিয়ে জ্যোতিবিদ্যার ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল যা কয়েক শতাব্দী পরে সমৃদ্ধতর অভিব্যক্তি অর্জন করেছিল। এছাড়া কৃষকদের পক্ষে বিশেষ

সহায়ক নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার পক্ষে এ শাস্ত্র অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

প্রাচীন সংস্কৃতিগুলিতে জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে; চীন, ব্যাবিলন ও মিশরে বর্ষপঞ্জী যাজকশ্রেণীর প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত হয়েছিল কেননা এর সাহায্যে সেসব দেশের মানুষ যজ্ঞানুষ্ঠানের পক্ষে সঠিক সময় নির্দেশ করতে পারত। কৃষকসমাজ একে সাদরে গ্রহণ করেছিল কারণ এর সাহায্যে বৃষ্টিপাত সম্পর্কে যথার্থ ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হল; এতে যাজকশ্রেণীর পুঁথিপত্রের গৌরব আরো বর্ধিত হল এবং আপাত-দুর্বোধ্য কলাশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের যথার্থতাও প্রমাণিত হলো।

বিবিধ সূত্র (বেদাঙ্গসূত্র)

প্রধান বেদাঙ্গ গ্রন্থগুলি রচিত হওয়ার পরেও বহুসংখ্যক সহায়ক গ্রন্থ প্রণীত হয়েছিল; এদের প্রধান বিষয়বস্তু হল প্রকৃত যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ এবং প্রাচীনতর রচনাগুলিতে আলোচিত বিষয়। যথা :– বৌধায়ন, গৌতম ও হিরণ্যকেশী প্রণীত পিতৃমেধসূত্রগুলি, শৌনক, পৈপ্পলাদ, কাত্যায়ন ও মানব শ্রাদ্ধকল্পগুলি, আশ্বালায়ন ও বৌধায়ন প্রণীত পরিশিষ্টসমূহ, গোভিলের 'কর্মপ্রদীপ', গোভিলপুত্রের 'গৃহ্যসংগ্রহ'; 'অথর্বপরিশিষ্ট'। শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা' দেবতা ও প্রত্নকথাসমূহের সংক্ষিপ্তসার এবং তাঁর 'ঋথিধা' একটি মিশ্রবিষয়যুক্ত অর্বাচীন রচনা। এরূপ সম্পূরক গ্রন্থ প্রণয়নের ঐতিহ্য নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলছিল; ফলে আমরা বেশ কিছু অনুক্রমণী পেয়েছি–যেখানে ঋষি, ছন্দ ও দেবতার নাম এবং গ্রন্থবিভাগের বিস্তৃত বিবরণের শ্রেণীবদ্ধ সূচীপত্র রয়েছে। শৌনক ছটি

ঋগ্বেদীয় অনুক্রমণীর রচয়িতা এবং কাত্যায়ন বিখ্যাত 'সর্বানুক্রমণীর প্রণেতা। এই গ্রন্থসমূহ বৈদিক ঐতিহ্যের সমাপ্তি সূচিত করছে; এর পরবর্তীকালে যা কিছু রচিত হল, তা মূলত এই ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র– পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতির উপযোগী, রূপান্তরসাধনের প্রয়োজনে সেসব গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণ অবৈদিক উপাদান আত্মসাৎ করেছিল।

ছন্দোবদ্ধ রচনা যে চার বা পাঁচ শতাব্দী ধরে ক্রমোন্নতি লাভ করেছিল, বৈদিক ছন্দশাস্ত্রও সেসময় ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল। এ-বিষয়ে দুটি রচনা পাওয়া যায় 'নিদানসূত্র' ও 'পিঙ্গলছন্দসূত্র'। নিদানসূত্রের প্রথম দশটি প্রপাঠক সামবেদের সঙ্গে সম্পর্কিত যেহেতু এখানে উকথ, স্তোম, গান প্রভৃতি সামবেদীয় বিষয়ই মুখ্যত বিবৃত হয়েছে; কারো কারো মতে এই অংশ পতঞ্জলির রচনা। এর ভাষা কৌতুহলজনক কারণ এতে নিহিত ব্যাকরণের চরিত্র কতকটা অদ্ভূত। বৃহদেবতা'' গ্রন্থে সেসমস্ত শ্লোক নিদানসূত্র' থেকে উদ্ধৃত বলে বর্ণিত হয়েছে–সেসব কিন্তু নিদানসূত্রে পাওয়া যায় নি। এই গ্রন্থে বিবৃত সমস্ত ছন্দই বৈদিক। কিন্তু পিঙ্গলছন্দঃসূত্র অর্বাচীন রচনা; এর দুটি পাঠভেদ ঋগ্বেদ ও সামবেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বৈদিক ছন্দের পাশাপাশি কিছু কিছু বেদোত্তর অর্থাৎ ধ্রুপদী ছন্দও এতে আলোচিত হওয়ায় গ্রহের অর্বাচীনততার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে; পিঙ্গলকেই এর রচয়িতা বলে বলা হয়।

কল্পসূত্র (বেদাঙ্গসূত্র)

সূত্রসাহিত্যের ছটি শ্রেণীর মধ্যে কল্পসূত্রগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কল্পসূত্রগুলি আবার চারভাগে বিন্যস্ত : শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্ব। এদের মধ্যে

বেদের সঙ্গে সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত হল শৌতি সূত্র–প্রধান, বিশেষত সামূহিকভাবে পালনীয়, যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির বিভিন্ন অনুপুঙ্খ এতে বিবৃত হয়েছে। শ্রৌতসূত্রে আলোচিত অনুষ্ঠানগুলি মুখ্যত তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায় : (ক) নিত্য অর্থাৎ আবশ্যিক অনুষ্ঠান–প্রত্যহিক ও সাময়িক; যেমন : অগ্নিহোত্র ও দর্শপুর্ণমাস। আর্য পুরুষকে সমগ্র জীবনব্যাপী এই অনুষ্ঠানগুলি পালন করতে হত। (খ) নৈমত্তিক অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ সময়ে পালনীয় অনুষ্ঠান যেমন রাজসূয়, বাজপেয় এবং (গ) কাম্য অর্থাৎ পুত্র, গোধন, বৃষ্টিপাত, বিজয়লাভ প্রভৃতি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অনুষ্ঠান। যজ্ঞের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক থাকায় মনে হয় যে শ্রৌতসূত্রগুলি বিভিন্ন পুরোহিত পরিবারেই উদ্ভূত হয়েছিল এবং সম্ভবত এগুলি প্রাচীনতম সূত্র-সাহিত্যের নিদর্শন। প্রতি বেদে, এমন কি তার প্রতি শাখায় যজ্ঞসম্পাদক পুরোহিতদের নিজস্ব শৌতিসূত্র ছিল। ঋগ্বেদের দুটি শ্রৌতসূত্র ছিল : আশ্বলায়ন ও শাখায়ন। অধিকাংশ শ্রৌতসূত্রের অধ্যায়গুলি 'প্রশ্ন' নামে অভিহিত; তাই অনুমান করা যায় যে, এই গ্রন্থগুলি যজ্ঞের যথার্থ পালন-বিধি সংক্রান্ত শিক্ষানবীশ পুরোহিতের প্রশ্ন ও শিক্ষকের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। অবশ্য এই দ্বান্দ্রিক আঙ্গিক প্রচলিত পাঠে এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না কেননা সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ পরিত্যক্ত হয়ে গেছে; তবে উৎসগত বিচারে প্রাগুক্ত আঙ্গিক ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপনিষদ সাহিত্যের সঙ্গে শ্রৌতসূত্রের নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে।

আশ্বালায়ন শ্রৌতসূত্রে বারোটি অধ্যায় আছে। বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে নামকরণ শিক্ষকের নামে হয়েছিল, কিন্তু আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের ক্ষেত্রে ছাত্রের নামই রয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা যদিও শৌনক, তিনি তার শিষ্য আশ্বলায়নের নামে রচনাটিকে পরিচিত হতে অনুমতি দিয়েছিলেন, হয়ত আশ্বলায়ন কিছু পরিমার্জন করেছিলেন। অশ্বমেধ, প্রবর্গ ও রাজসূয় ব্যতীত প্রায় সমস্ত প্রাচীনতর ও প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান এই গ্রন্থে আলোচিত

হয়েছে; তাছাড়া এতে হােতা, মৈত্রাবরণ, আচ্ছাবাক ও গ্রাবষ্টুতের মতো ঋগ্বেদীয় পুরোহিত, এবং অথর্ববেদীয় পুরোহিত ব্রহ্মা ও যজমানের কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিবৃত পয়েছে। অন্যান্য অর্বাচীন শ্রৌতসূত্রের মতো আশ্বালায়নে মন্ত্রবিশ্লেষণের সাধারণ নিয়মাবলী সংক্রান্ত পৃথক 'পরিভাষা' অধ্যায় নেই; এ ধরনের নিয়ম গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এবং প্রসঙ্গ অনুযায়ী এদের আবির্ভাব ঘটেছে। নিয়মগুলি জটিল, তাই রচনাও দুরুহ।

শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র আশ্বলায়ন অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং ঋথেদের বাষ্কল শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু আশ্বলায়ন শাকল ও বাষ্কল–এই উভয় শাখার সঙ্গে সম্পর্কিত; শঙ্খ পরিবারভুক্ত সুযজ্ঞ আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা। সতেরোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে সবগুলি নিবিদ বিবৃত হয়েছে (৮ : ১৬-২৩)। শেষ দুটি অধ্যায়ে আলোচিত মহাব্রত অনুষ্ঠানটি পরবর্তীকালে সংযোজিত; একই শাখার আরণ্যকে বিন্যস্ত অনুরূপ অধ্যায়টির নিবিড় অনুসরণ এখানে স্পষ্ট। শাখায়নের অবশ্য একটি পৃথক পরিভাষা অধ্যায় আছে। আশ্বলায়নের তুলনায় এই গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক যজ্ঞ আলোচিত হলেও এর তালিকায় কয়েকটি অনুষ্ঠান যুক্ত হয়েছেযা থেকে আমরা প্রাচীন যজ্ঞের কিছু কিছু নুতন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হই। পুরুষমেধ সম্পর্কে এই গ্রন্থে একটি সম্পূর্ণ ও বিবিধ-অনুপুঙ্খাযুক্ত অংশ রয়েছে; তবে স্পষ্ট বোঝা যায়, বহু পূর্বেই অনুষ্ঠানটি অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ব্রাহ্মণসাহিত্যের সঙ্গে এর প্রবল সাদৃশ্য স্পষ্ট, এতেও গ্রন্থটির অধিকতর প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়।

তৈত্তিরীয় সংহিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু শ্রৌতসূত্রে সন্ধান পাওয়া যায়; পুরোহিতের কার্যকলাপের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত বিধিগ্রন্থের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, বিশেষভাবে, বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভূত বিভিন্ন

শাখার আনুষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতি পরস্পর ভিন্ন হতে বাধ্য। তৈত্তিরীয় শাখার শ্রৌতসূত্রগুলির সময়ানুক্রমিক তালিকা এভাবে দেওয়া যায় : বৌধায়ন ও বাধুল; তারপর ভরদ্বাজ, আপস্তম্ব, সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশী এবং শেষে বৈখান্‌স।

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ত্রিশটি প্রশ্ন বা অধ্যায়ে বিন্যস্ত একটি প্রাচীন গ্রন্থ। এতে প্রায় সমস্ত প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান আলোচিত হয়েছে; এগুলির মধ্যে সৌত্রামণী, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও সর্বমেধের মতো নবীনতর অনুষ্ঠানও আছে। পিতৃপুরুষের তালিকা-সহ একটি পৃথক পরিভাষা অংশ, মন্ত্রসংগ্রহ এবং হাোতৃশ্রেণীর পুরোহিতের কর্মপদ্ধতি এখানে বিবৃত হয়েছে। এই গ্রন্থটি নিকক শ্রৌতসূত্র থেকে অনেকাংশে পৃথক, অন্য শ্রৌতসূত্রগুলির তুলনায় এটি পূর্ণতর এবং প্রকৃতপক্ষে একটি সম্পূর্ণ কল্পসূত্র; কারণ এর একটি করে গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র আছে। তৈত্তিরীয় শাখার ভরদ্বাজ শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে আলোচ্য আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রের প্রভূত সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এটা আরো কৌতুহলপ্রদ, কারণ অন্য সহযোগী রচনা থেকে ঋণ গ্রহণে এর কুণ্ঠা নেই।

ত্রিশটি প্রশ্নে বিন্যস্ত বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র সম্ভবত প্রাচীনতম; বাধূল সম্ভবত একই যুগ কিংবা সামান্য পরবর্তীকালের রচনা। বৌধায়নে আলোচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রধান যজ্ঞগুলি, এবং প্রবর্গ্য ও অশ্বমেধ এবং কয়েকটি অপরিচিত বিষয়। স্পষ্টতই এটি এমন যুগে রচিত যখন শ্রৌতবিষয়ক মুখ্য রচনাংশেই এমন সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল যা পরবর্তী পর্যায়ে পৃথক সহায়ক রচনাসমূহে স্থান পেয়েছিল। তাই এতে কর্মান্ত অনুষ্ঠান, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রবর-তালিকা সম্বলিত বিভিন্ন অংশ এবং শুল্বসূত্রের উপযোগী একটি অংশ পাওয়া যায়। রচনা বিশ্লেষণ করে এই তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রচলিত গ্রন্থটি একাধিক লেখকের রচনা; বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচনারীতির নিদর্শন রয়েছে। এই প্রাচীন গ্রন্থে অনেক প্রাচীনতর

বিশেষজ্ঞদের অভিমত উদ্ধৃত হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে শ্রৌতসূত্রগুলি রচনার পশ্চাতে সুদীর্ঘ একটি ইতিহাস রয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতার উল্লেখ থাকায় মনে হয় সূত্র রচিত হওয়ার পূর্বেই এই সংহিতা তার প্রচলিত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। অবশ্য কাঠক সংহিতার সঙ্গেই এই সূত্রের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। লিপিগত সাক্ষ্য থেকে মনে হয় বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র দক্ষিণাঞ্চলে উদ্ভূত হয়েছিল। সম্ভবত দক্ষিণাঞ্চলের পাণ্ডুলিপি রাণায়নীয় ও উত্তরাঞ্চলের পাণ্ডুলিপি কৌথুম শাখার পাঠ আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

তৈত্তিরীয় শাখার দীর্ঘতম শ্রৌতসূত্র হল সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশী রচিত গ্রন্থ। উনচল্লিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত বহু সূত্র উভয়ের মধ্যে সাধারণ। বিষয়বস্তুর তালিকাটি দীর্ঘ এবং একটি পৃথক পরিভাষা অংশ এর প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অর্বাচীনতর যজ্ঞসমূহের মধ্যে প্রবর্গ্য, বাজপেয়, রাজসূয়, সৌত্রামণী, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ, মহাব্রত ও গবাময়ন এতে আলোচিত হয়েছে। সৌত্রিমণীর দুটি রূপভেদের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই– চারক ও কোকিলী। ‘সব’ যজ্ঞের নিয়মাবলী এতে বিবৃত; তাছাড়া ভরদ্বাজ প্রণীত পিতৃমেঙ্কের বিশেষ রূপভেদও এতে রয়েছে। গৃহ, শুল্ব ও ধর্ম সূত্রের অন্তর্ভুক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে আলোচ্য গ্রন্থটি ব্যাপক সূত্র ঐতিহ্যের অন্তর্গত।

পনেরোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত বাধূল শ্রৌতসূত্র সূত্রসাহিত্যের প্রাচীনতম পর্যায়ের অন্যতম, সম্ভবত তা বৌধায়নের সমকালীন। অধ্যাপক কাশীকারের মতে গ্রন্থটি হয়তো তৈত্তিরীয় সংহিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না, এর সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত অন্য কোনো পাঠভেদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। পরিভাষা বিষয়ক কোনো পৃথক অধ্যায়। এতে নেই; তবে প্রধান যজ্ঞগুলির বিবরণ ছাড়াও এতে ‘ব্রাহ্মণ’ নামক কয়েকটি অংশও রয়েছে (তুলনীয় পশুবন্ধ বা অগ্নিচয়ন ব্রাহ্মণ)-এতে একই সঙ্গে রচনাটির প্রাচীনত্ব এবং ব্রাহ্মণসাহিত্যের

সঙ্গে কালগত সান্নিধ্য প্রমাণিত হচ্ছে। তাই একে আমরা সূত্রব্রাহ্মণের যুগলবন্ধ রাূপে হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। এই গ্রহে বাধুলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত; পণ্ডিতরা মনে করেন যে এটা প্রকৃতপক্ষে গোষ্ঠীনাম-যা যাস্ক ও ভৃগুদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে বন্ধ ছিল। এই শ্রৌতসূত্রের লেখক। আপস্তম্বের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে আবির্ভূত হয়ে অগ্নিবেশ্যকে শিক্ষা দান করেছিলেন-অগ্নিবেশ্যের গৃহ্যসূত্র আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে। বাধূল শ্রৌতসূত্রের প্রাচীনতা নানাভাবে প্রমাণ করা যায়; যেমন : রচনার মিশ্র সূত্র-ব্রাহ্মণ চরিত্র, বহু গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তি, মন্ত্রের ব্যাপক সংগ্রহ এবং কোনো কিছুকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ না-করার মনোভাব–ঐতিহ্যগত নির্দেশগুলিকে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ না করে এটি প্রতিটি অনুষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছে।

বৈখানস শ্রৌতসূত্র 'ঔখীয়সূত্র' নামেও পরিচিত; একুশটি প্রশ্নে বিন্যস্ত এই রচনাটি তৈত্তিরীয় শাখার অপর প্রধান সূত্র। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে গৃহ্যসূত্র শ্রৌতসূত্রকে অনুসরণ করেছে; ঐ গৃহসূত্রে এগারটি প্রশ্ন রয়েছে। একটি পরিভাষা অধ্যায় ছাড়াও তাতে বহু প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে; তবে অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ বা রাজসূয়ের মতাে অর্বাচীন যজ্ঞসমূহ আলোচিত হয় নি। সোমব্যাগগুলির উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। ইষ্টি ও সোমের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক দুটি অংশে এতে রয়েছে সেগুলিই এর শেষ দুটি অধ্যায়। তৈত্তিরীয় শাখার মধ্যে বৈখানস শ্রৌতসূত্র যে অর্বাচীনতম রচনা, তা এর সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক চরিত্র থেকেই প্রমাণিত। এটা স্পষ্টত বৈষ্ণব ধারার গ্রন্থ; এতে নারায়ণের স্তুতি এবং নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী ভস্ম দিয়ে ললাট চিহ্নিত করার বিশেষ বৈষ্ণবীয় আচারের বিবরণ আছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ভস্ম গার্হাপত্য অগ্নি থেকে আহরণ করতে হত। সম্প্রদায়কেন্দ্রিক পৌরাণিক বিশ্বাস যে ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে, তা নিম্নোক্ত প্রতিশ্রুতিতে স্পষ্ট : 'এই ভস্ম-চিহ্ন যে

ব্যবহার করে, সে পূণ্য অর্জন করে" শেষ পর্যন্ত পরমাত্মার সঙ্গে সম্মিলিত হয়"। মনে হয়, একদা এই শাখার জন্য একটি পৃথক ব্রাহ্মণ ছিল; কিন্তু পরে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বৈখানস নিজস্ব মন্ত্রসংহিতার অস্তিত্বকে অনুমান করে নিয়েছে, তবে তার সমগ্র রূপটি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে নি। এর ভাষা ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রযুক্ত গদ্যের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী—তাই বহু দুর্বোধ্য ও ত্রুটিপূর্ণ রীতির অস্তিত্ব তার বৈশিষ্ট্য সূচিত করছে।

পনেরোটি প্রশ্নে বিন্যস্ত সংক্ষিপ্ত ভারদ্বাজ শ্রৌতসূত্র মাত্র দশটি যজ্ঞ আলোচনা করেছে। জ্যোতিষ্টোম ছাড়া অন্য কোনো সোমাযোগ এতে আলোচিত হয় নি; তবে এতে অধ্বর্যু শ্রেণীর পুরোহিতদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি এবং পূর্বানুমিত প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে আরেকটি অংশ রয়েছে। সম্ভবত মূল গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ রূপটি আমাদের কাছে পৌঁছয় নি। কারণ পরবর্তী সাহিত্যে আরো কিছু যজ্ঞ সম্পর্কে ভারদ্বাজ শ্রৌতসূত্রের এমন সব বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যা প্রচলিত পাঠে পাওয়া যায় না। এরকম একটি যজ্ঞ হল অশ্বমেধ। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এই রচনার সঙ্গে বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

কাঠক শ্রৌতসূত্রের পাঠটি নামমাত্রে পর্যবসিত; কারণ এর সামান্য কিছু অংশই মাত্র আমাদের কাছে পৌঁছেছে–রচনার বিপুল অংশই এখনও বিলুপ্ত। এরকম একটি প্রচলিত অংশে আমরা পিণ্ডপিতৃ যজ্ঞের যে নির্দেশাবলী পাই—তাতে শ্রৌতসূত্রে আলোচিত হওয়ার যৌক্তিকতা সংশয়াতীত নয়, কেননা গৃহসূত্রেই এগুলি অধিক মানানসই।

মৈত্রায়ণী শাখায় দুটি শ্রৌতসূত্র রয়েছে : মানব ও বারাহ। মানব শ্রৌতসূত্র নানাভাবে পরিচিত : মানব মৈত্রায়ণীয়' বা শুধু মৈত্রায়ণীয়'। এর একুশটি অধ্যায়ে বহু প্রধান যজ্ঞ আলোচিত হয়েছে; কিছু কিছু অংশে বিচিত্র বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক

বৈশিষ্ট্যযুক্ত কিছু কিছু বৈষ্ণব অনুষ্ঠান এবং 'গোনামিক' ও 'অনুগ্রাহিক'। এছাড়া এতে আছে পিতৃপুরুষের একটি তালিকা, একটি পরিশিষ্ট, শ্রাদ্ধবিষয়ক একটি অংশ এবং একটি সংশ্লিষ্ট শুল্বসূত্র।

বারাহ শ্রৌতসূত্র নামক অর্বাচীন রচনাটি তেরটি অধ্যায়ে ও তিনটি পৃথক অংশে বিন্যস্ত। কয়েকটি প্রধান যজ্ঞের সঙ্গে (এদের মধ্যে সোমব্যাগের বিবিধ রূপভেদই প্রধান) মহাব্রত এবং 'উৎসর্গিণাম আয়ন' ও 'একাদশিনী' মতো অপ্রচলিত অপ্রধান অনুষ্ঠানও এতে আলোচিত হয়েছে। মানব শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে এর নিবিড় সাদৃশ্য লক্ষণীয়; একমাত্র পার্থক্য এই যে, বারাহে পরিভাষা অংশ অনুপস্থিত। এর শব্দভাণ্ডারে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়; এতে এমন কিছু শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে যা অন্য কোনো সূত্র গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

বাজসনেয়ী শাখার কথা ও মাধ্যন্দিন–এই উভয় পাঠে একটিমাত্র শ্রৌতসূত্র রয়েছে; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র; এর সঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট গৃহ্যসূত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় যদিও সেই গৃহ্যসূত্রের নামকরণে কাত্যায়ন অনুপস্থিত। এই শাখায় গৃহ্যসূত্রকে পারস্কর গৃহ্যসূত্র বলা হয়। পারস্কর সম্ভবত কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রেরও রচয়িতা কারণ এই সূত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাত্যায়ন এবং সর্বানুক্রমণীয় রচয়িতা অভিন্ন নন। এতে পরিভাষা সম্পর্কে একটি পৃথক অধ্যায়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর পিতৃপুরুষের একটি তালিকা এবং কৌকিলী, সৌত্রিমণী, পিতৃমেধ ও দীক্ষায়ণ যজ্ঞের মতো কিছু কিছু স্বল্প প্রচলিত অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে। বাজসনেয়ী সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণের সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; যদিও এমন কিছু অনুষ্ঠান এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা সংহিতায় পাওয়া যায় না, তবু সূত্রটি প্রাগুক্ত সংহিতাকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছে।

সামবেদের পাঁচটি শ্রৌতসূত্র আমাদের কাছে পৌঁছেছে : ল্যাটায়ন, দ্রাহ্যায়ণ, জৈমিনীয়, আর্যেয়কল্প ও নিদানসূত্র। ল্যাটায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ–এই দুটিকেই কৌথুম ও রাণায়নীদের দশটি শ্রৌতসূত্রের তালিকার মধ্যে পাওয়া যায়। এই দুটি গ্রন্থ নিশ্চিতই প্রাচীনতর, যেহেতু নিজেদের শাখায় এগুলি প্রথম সূত্র। লাট্যায়ন দশটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত–প্রতিটি প্রপাঠক আবার বারোটি করে কণ্ডিকায় বিভক্ত। সামবেদীয় রচনারূপে এতে প্রধানত উদগাতা শ্রেণীর পুরোহিত ও তার সহায়কদের দায়িত্ব এবং সোমযাগে ব্রহ্মা শ্রেণীর পুরোহিতদের কর্মপদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। এতে কয়েকটি অনুষ্ঠান বিবৃত হলেও এই সব যজ্ঞে গীত মন্ত্রসমূহই প্রধান বিবক্ষিত বস্তু। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের প্রচুর উদ্ধৃতি এই সূত্রে রয়েছে। বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতিতে বহু প্রাচীন বিশেষজ্ঞদের নাম উল্লিখিত হওয়ার ফলে এই গ্রন্থের পশ্চাদবর্তী দীর্ঘ ঐতিহ্য সম্পর্কে আমরা অবহিত হই।

দ্রাহ্যায়ণ শ্রৌতসূত্রের রূপটি স্পষ্ট নয়; কারণ এর বত্রিশটি পটলের মধ্যে মাত্র পনেরোটি এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি পটল আবার চার খণ্ডে বিন্যস্ত। মোট সাতটি যজ্ঞ এতে বিবৃত হয়েছে—মূলত এগুলি হল সোমযাগের রূপভেদ। ল্যাটায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ একই বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়েছে বলে এবং ভাষারীতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক নিবিড় সাদৃশ্যযুক্ত হওয়াতে এদের একটি অভিন্ন গ্রন্থের সামান্য ভোদযুক্ত দুটি শাখা হিসাবে গণ্য করা হয়। অবশ্য, এদের মধ্যে লাট্যায়ন সংবদ্ধতর এবং দ্রাহ্যায়ণে প্রাপ্ত অনুষ্ঠানতত্ব অংশ প্রথমোক্ত গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে বলে বিশুদ্ধতর পাঠ এতে সংরক্ষিত।

জৈমিনীয় শ্রৌতসূত্র একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ; এতে মাত্র বিশটি খণ্ড আছে। অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠানে গীত সামমন্ত্রগুলি বিবৃত হওয়ার পরেই রয়েছে প্রবর্গ্য

অনুষ্ঠান বিষয়ক একটি পৃথক অংশ মন্ত্র-গানের ক্রম বর্ণনার ক্ষেত্রে জৈমিনীয় বৌধায়নকে অনুসরণ করেছে।

চৌদ্দটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত 'আর্যেয়কল্পে' 'মশক কল্পসূত্র' নামেও পরিচিত; আবার, শেষ তিনটি প্রপাঠক নিয়ে গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্রসূত্র। এই গ্রন্থের রচয়িতা মশক এবং তা নিশ্চিতই লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর, যেহেতু এই দুটি গ্রন্থের নিকট আর্যেয়কল্প পরিচিত ছিল। এতে যে আটটি যজ্ঞ আলোচিত হয়েছে মূলত সেসব সোমযোগেরই রূপভেদ; এই যজ্ঞগুলিতে গীত সামমন্ত্রের তালিকা ছাড়াও প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে একটি অংশও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণকে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করেছে; অবশ্য দ্বিতীয়োক্ত রচনায় যেসব অনুষ্ঠান বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, সেসব এতে বর্জিত হয়ে গেছে। যে গ্রামগেয়, আরণ্যগেয়, ঊহ, উহ্যগানগুলি আর্যেয়কল্পে প্রদত্ত সামমন্ত্রের ক্রমকে অনুসরণ করেছে বলে মনে হয়–তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগসূত্র রয়েছে। এই গ্রন্থ মোটামুটিভাবে সুসংবদ্ধ, পুনরাবৃত্তির প্রবণতা থেকেও মুক্ত। ক্ষুদ্রসূত্রের নামকরণের সম্ভাব্য কারণ হলো রচনার সংক্ষিপ্ততা; এতে মাত্র তিনটি অধ্যায় আছে। পরবর্তীকালের সামবেদীয় সহায়ক রচনাগুলিতে এটি এই বর্ণনাত্মক নামেই পরিচিত ছিল। 'উপগ্রন্থসূত্র' নামক কাত্যায়ণ রচিত ক্ষুদ্রসূত্রের অংশবিশেষে 'প্রতিহার' নামক সামমন্ত্রের বিশেষ একটি শ্রেণী ব্যাখ্যাত হয়েছে। ভাষাগত বিচারে একে আর্যেয়কল্প অপেক্ষা প্রাচীনতর বলে মনে হয়।

দশটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত নিদানসূত্র' প্রকৃতপক্ষে আর্যেয়কল্প গ্রন্থের পাঠান্তর; সামবেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহ এর প্রত্যক্ষ পূর্বসূরী। গৌতম তাঁর পিতৃমেধসূত্র গ্রন্থে আলোচ্য রচনার যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে নিদানসূত্রের রচয়িতারূপে পতঞ্জলির নাম উল্লেখিত হয়েছে। রাণায়নীয় বা কৌথুম শাখার পাঠভেদের সঙ্গে এর কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই বলে কেউ কেউ

মনে করেছেন, এটি ‘ভাল্লবেয়’ শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বহু ঐতিহাসিক ও সাহিত্যবিষয়ক তথ্য জোগান দিয়েছে বলে রচনাটি কৌতূহলজনক। এর প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল বৈদিক ছন্দ। দুটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত ‘কল্পনুপদসূত্র’ নামক পরিশিষ্টকে ক্ষুদ্রসূত্রের বিভিন্ন অংশ-সম্পর্কিত ভাষ্য বলে মনে হয়। নিদানসূত্রের নবীনতা ভাষাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকেই স্পষ্ট; তবে প্রচলিত পাণ্ডুলিপি বিকৃতিমুক্ত নয়।

‘বৈতান’ ও ‘কৌশিক’ —অথর্ববেদের এই দুটি সূত্রে একটি অসাধারণ ক্রম পরিলক্ষিত হয়; কেননা গৃহসূত্রের বৈশিষ্ট্যযুক্ত কৌশিক সূত্র বৈতানের পূর্ববর্তী। বিভিন্ন লেখকের রচনা হলেও এদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক লক্ষণীয়। বৈতানসূত্রের রচয়িতা কৌশিকের উপর নির্ভরশীল এবং বেশ কিছু উদ্ধৃতিও চয়ন করেছেন; শাস্ত্র-অংশে আশ্বলায়নের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রচনাটি যদিও শৌনক শাখার অন্তর্গত, তবু এটি পৈপ্পলাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। বৈতানসূত্রে আটটি অধ্যায় ও তেতাল্লিশটি কণ্ডিকা রয়েছে; রচনার প্রথম শব্দ অনুযায়ী এর এরূপ নামকরণ হয়েছে। পরিভাষা অধ্যায় দিয়ে গ্রন্থের সূত্রপাত; এছাড়া এতে প্রধান যজ্ঞসমূহ, বিশেষত সোমযাগগুলি এবং রাজসূয়, বাজপেয়, সৌত্রামণী, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ ও গবাময়ন আলোচিত হয়েছে। রাজাদের উপযোগী বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির উপর প্রচুর গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখা যায়; কারণ আমরা জানি, অথর্ববেদের পুরোহিত মূলত রাজপুরোহিত। গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন; অথর্ববেদের স্বীকৃতিলাভের পরে, তবে সম্ভবত গোপথ ব্রাহ্মণের উদ্ভবের পূর্বে এটি রচিত হয়েছিল।

শৌনক শাখার অন্তর্গত কৌশিকসূত্রে প্রায়শ বিকল্প অনুষ্ঠানই বিবৃত হয়েছে; এই গ্রন্থটি অবশ্য যথার্থ শ্রৌতসূত্র-পদবাচ্য নয়। এতে বহু গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানও আলোচিত হয়েছে; যেমন, জন্ম ও মৃত্যুসংক্রান্ত এবং ঐন্দ্রজালিক ও

ডাকিনীবিদ্যা বিষয়ক অনুষ্ঠান। একে অবশ্য একজনমাত্র লেখকের রচনারূপেও গ্রহণ করা যায় না; আলোচিত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে আমরা এই স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনাংশের একটি সংগ্রহ। গোপথ ছাড়াও অন্য একটি ব্রাহ্মণ সম্পর্কে এগ্রন্থ অবহিত ছিল, অবশ্য সেই ব্রাহ্মণটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বৈতান বা কৌশিক-কোথাও প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কিত কোনো অংশ নেই; কারণ, সম্ভবত, প্রায়শ্চিত্তসংক্রান্ত নিয়মাবলী ‘অথর্ব-প্রায়শ্চিত্তানি’ নামক ছ’টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত একটি পৃথক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাকে বৈতানের আটটি অধ্যায়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে মোট চোদ্দটি অধ্যায়ে সম্প্রসারিত করা হল যাতে সমসংখ্যক অধ্যায়ে বিন্যস্ত কৌশিকসূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়; আনুষ্ঠানিক শিথিলতার উপর অথর্ববেদীয় শ্রৌতসূত্রের গুরুত্ব আরোপ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ আনুষ্ঠানিক বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুষ্ঠানের বিধান-দানই ব্রহ্মাশ্রেণীর পুরোহিতের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব। চৈনিক ধর্মানুষ্ঠানবিষয়ক পুথি ‘লি খী’র মতো শ্রৌতসূত্রগুলিও যথাযথ নির্দেশ-সহ প্রকৃত অনুষ্ঠানের বিবরণ, অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময়, কার্যপরিচালকদের নির্বাচন করার নিয়ম, সংখ্যাবিষয়ক বিধি এবং যজ্ঞ আয়োজনের পদ্ধতি, অবস্থান ও উদ্দেশ্যসংক্রান্ত নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করেছে।

সহায়ক সূত্র

অধিকাংশ শ্রৌতসূত্র প্রণীত হওয়ার পরে পরিশিষ্ট হিসাবে কয়েকটি সহায়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে কয়েকটি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ও এবং

কয়েকটি যজ্ঞতত্ত্ববিষয়ক। পাঁচটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত 'ঋকতন্ত্র' প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাতিশাখ্য জাতীয় রচনা, যাতে মন্ত্রসমূহের পদে প্রয়োগকালীন পরিবর্তন সম্পর্কিত নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। বৌয়ায়ন, ভারদ্বাজ ও গৌতম পৃথকভাবে কয়েকটি পিতৃমেধ সূত্র রচনা করেছিলেন; এদের মধ্যে মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পালনীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসমূহ বিবৃত হয়েছে। এই বিষয়বস্তু যেহেতু শৌতি ও গৃহসূত্রের পক্ষে সমভাবে প্রয়োজ্য, এই উভয়বিধ সূত্র সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত রচনার সন্ধান এগুলিতে পাওয়া যায়। শাখায়ত ও মানব-শাখার পিতৃমেধ-সূত্রগুলি তৎসংশ্লিষ্ট শ্রৌত সূত্রগুলির অন্তর্গত, আবার কৌষীতক, আশ্বালায়ন, বৈখানস ও অগ্নিবেশ্য রচিত গ্রন্থগুলি এইসব শাখা সংশ্লিষ্ট গৃহ্য সূত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত। আপস্তম্ব এবং এমনকি, বৈখানস ও আশ্বালায়ন নিজেদের পিতৃমেধ-সূত্রগুলিতে শৌতি ও গৃহ্য সূত্রের মধ্যে সমানভাবে স্থাপন করেছেন।

একটি নির্দিষ্টশ্রেণীর রচনা 'পরিশিষ্ট' রূপে অভিহিত; যে সমস্ত বিষয়বস্তু প্রচলিত শ্রৌতসূত্রগুলিতে অপর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে কিংবা একটুও উল্লিখিত হয়নি সেসবই এখানে বিবৃত হয়েছে। আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন ও বারাহ-শাখার পরিশিষ্টসমূহ এই প্রবনতার ফলেই রচিত। অন্যদিকে মানবশাখার রচনায় পুরোহিতদের দক্ষিণার কথাটি আলোচিত হয়েছে। বৌধায়ন ও আপস্তম্ব রচিত 'হৌত্রসূত্র' গ্রন্থে হা েতা শ্রেণীর পুরোহিতদের দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে।

সামগানের বিধিসংক্রান্ত গৌণ সূত্রগুলি প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রধান হলো 'পুষ্প সূত্র' বা 'ফুল্ল সূত্র'। দশটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত গ্রন্থটিতে গ্রাম ও অরণ্যগেয় গানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামমন্ত্রগুলিকে অন্য মন্ত্রসমূহের উপযোগী করে পুনর্বিন্যাসের নিয়মাবলী এবং অন্যান্য অনুরূপ প্রয়োগিক বিধি বিবৃত হয়েছে। এই নিয়মগুলি বিধিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত। পুস্পসূত্র এতে

সম্পূর্ণ, যথাযথ ও সুশৃঙ্খল যে এতে উত্তরগানের অস্তিত্ব আভাসিত হয়েছে। এই রচনার পরিশিষ্ট সামমন্ত্ররূপে পরিচিত। এর তেরোটি প্রপাঠককে পুস্পসূত্রে অনুল্লিখিত দুটি বিষয়, অর্থাৎ উহগান ও উহ্যাগান আলোচিত হয়েছে।

দুটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত 'পঞ্চবিধ সূত্রে' বর্ণিত হয়েছে কিভাবে সামমন্ত্র পাঁচটি অপরিহার্য উপাদানে বিভক্ত হয়—প্রস্তাব, উদগীথ, উপদ্রব, প্রতিহার ও নিধন। প্রতিহার-সূত্রও প্রস্তাবসূত্র প্রস্তোতা ও উদগাতার দ্বারা সোমমন্ত্রের নির্দিষ্ট অংশ গানের পদ্ধতি বিবৃত করেছে। তিনটি পটলে বিন্যস্ত 'গায়ত্র বিধান" সূত্র গায়ত্র গানের বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মন্ত্রকে পুনর্বিন্যস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। তিনটি খণ্ড ও তেতাল্লিশটি শ্লোকে বিন্যস্ত "স্তোভানুসিংহার' গ্রন্থে সামুমন্ত্রের সঙ্গে স্তোত্রকে যুক্ত করার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। তিনটি খণ্ডিকার বিভক্ত মাত্রলক্ষণ সূত্র' নামক সংক্ষিপ্ত রচনায় মন্ত্রের অক্ষরসমূহের দৈর্ঘ্য আলোচিত হয়েছে; সহায়ক শ্রৌতসূত্র অপেক্ষা একে প্রাতিশাখ্য রূপে গ্রহণ করাই সমীচীন।

শৌতসূত্রগুলি বৈদিক যজ্ঞচর্যার চূড়ান্ত পর্বের রচনা; এই পর্যায় প্রকৃতপক্ষে যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণের সঙ্গে শুরু হয়েছিল-প্রসারণশীল যজ্ঞতত্ত্ব তখন জীবন্ত শক্তিরূপে বিদ্যমান ছিল। ভৌগোলিক সীমার প্রসারণ, ক্রমবর্ধমান সংমিশ্রণ, নির্দিষ্ট কিছু পরিবার ও বিভিন্ন অঞ্চলে আনুষ্ঠানিক প্রয়োগবিধির বৈচিত্র্যের ফলে এইসব ক্রমাগত, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্যভাবে, পরিবর্তিত হল। যজ্ঞানুষ্ঠানগুলিকে সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করা এবং এদের ব্যাখ্যাগম্য ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা ছাড়াও ব্রাহ্মণসাহিত্যের অর্থবাদ অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। সূত্রসাহিত্যের প্রতি শাখা (যজতত্ত্ব, জ্যামিতি, জ্যোতিষ বা নিরুক্তনির্বিশেষে)-গৃহ্য ও ধর্মসূত্রের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া-ব্রাহ্মণ সাহিত্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই

পর্যায়ের অন্য সীমায় যজ্ঞানুষ্ঠান যখন দ্রুত শক্তি হারিয়ে নিঃশেষিতপ্রায় হয়ে উঠেছিল, ক্ষীয়মান ধর্মচর্যাকে সংরক্ষিত করার নূতন ধরনের প্রয়োজন অনুভূত হল-গড়ে উঠল। সূত্রসাহিত্য। কোনো কোনো সূত্রের প্রাথমিক রূপ সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু সেই স্তরে তা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের অভিন্ন অংশ হিসাবে গণ্য হত। সূত্র ও ব্রাহ্মণের ভাষাগত নিবিড় সাদৃশ্যের কারণকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের মনে হয়, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে সর্বাধিক সূত্রসাহিত্য রচিত হয়েছিল।

শৌতসূত্রগুলিতে আমরা এমন একটি সমাজের ছবি দেখতে পাই যেখানে যজ্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত রকম জটিলতাসহ সম্পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল এবং বেশ কিছু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন শাখার অস্তিত্ব জাগারুক ছিল।

গৃহ্যসূত্র

শৌতসূত্রগুলিতে যেখানে প্রধান সামূহিক যজ্ঞসমূহ বিবৃত হয়েছে, গৃহ্যসূত্রগুলিতে সেখানে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানবিষয়ের নিয়মাবলী আলোচিত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক অনুষ্ঠানসমূহ-সন্তানসম্ভাবনা থেকে মৃত্যুর বহু পরবর্তী পারলৌকিক ক্রিয়া পর্যন্ত সেসব বিস্তৃত। এগুলি তাদের লক্ষ্য, বিষয়পরিধি ও ক্রমিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে শৌতি অনুষ্ঠান অপেক্ষা ভিন্ন। শ্রৌত অনুষ্ঠানগুলি যেখানে মূলত সমগ্র গোষ্ঠীর সামূহিক কল্যাণ কামনা করে, গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানসমূহ সেক্ষেত্রে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, কেননা এগুলি সর্বতোভাবে পরিবার-কেন্দ্রিক। গৃহ্যসূত্রগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এদের মধ্যে ‘পাকযজ্ঞ’ নামে অভিহিত প্রায় চল্লিশটি অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী বিবৃত হয়েছে। এদের আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

(ক) হুত অর্থাৎ যখন অগ্নিতে আহুতি অর্পণ করা হয়; যেমন বিবাহে বা গর্ভবতী রমণীর সীমস্তোন্নয়ন অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে। (খ) অহুত অর্থাৎ যেখানে আহুতি আদান-প্রদান হয়; যেমন উপনয়নে ও স্নাতকদের জন্য দীক্ষান্ত অনুষ্ঠানে। (গ) প্রহুত অর্থাৎ যেখানে বিশেষ ধরনের আহুতি অর্পণ করা হয়; যেমন জন্মপরবর্তী অনুষ্ঠানে। প্রধান অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে বহু গৌণ সহায়ক আচারও রয়েছে; যেমন, গর্ভাবস্থার অনুষ্ঠানগুলি-এদের মধ্যে আছে গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন।

জন্মের পরে নবজাত শিশুর কল্যাণের জন্য জাতকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। তারপর একে-একে পালিত হয় আদিত্যদর্শন, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চোল বা চুড়াকরণ, গোদান ও উপনয়ন অনুষ্ঠান। উপনয়নের পরে বেদাধ্যয়ন বা স্বাধ্যায়ের সূচনা হয়; এই সঙ্গে থাকে। অন্যধ্যায় ও শেষে সমাবর্তন। তারাপ স্নাতক গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে গ্রাহঁত্যু আশ্রমে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে পাণিগ্রহণ, অগ্নিপরিগ্রহণ, অশ্বারোহন, সপ্তপদী ও লাজহাােম। বিবাহিত গৃহস্থকে প্রতিদিন আবশ্যিক নিত্যকর্ম ও বিভিন্ন সাময়িক যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়।

এইসব প্রধান অনুষ্ঠান ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সমস্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্রের জন্য নানাধরনের অনুষ্ঠান রয়েছে; যেমন–গৃহনির্মাণ, বীজ বপন, শস্য আহরণ, সর্প ও বিষাক্ত কীট বিতাড়ন, অতিথিকে খাদ্য ও আশ্রয়দান, আরোগ্যলাভ, দারিদ্র্য নিবারণ, বিভিন্ন উদ্যোগে সফলতা, অমঙ্গলসূচক লক্ষণ, এমনকি অশুভ স্বপ্নের জন্য উপযুক্ত প্রতিবিধান। মানুষের সমগ্র জীবন প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠান দ্বারা আবৃত ছিল; আদিম মানুষের মানসিকতায় ধর্মীয় ও লোকায়িত জীবনধারার মধ্যে কোনও স্পষ্ট ভেদরেখা ছিল না। এই মানসিকতায় পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অসংখ্য অমঙ্গল শক্তির দ্বারা আকীর্ণ ছিল; এদের মধ্যে রয়েছে জীবনের সুখকর ভোগ থেকে

বঞ্চিত মৃতমানুষের আত্মা—এরা জীবিত মানুষ সম্পর্কে অসূয়াপরায়ণ হয়ে সর্বদা ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে এমন বিশ্বাস ছিল। জীবনকে যেহেতু নেতিবাচক ও ধবংসাত্মক শক্তি থেকে রক্ষা করতে হবে, তাই প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যযুক্ত পরিস্থিতির জন্য কোনো অনুষ্ঠান নির্দেশিত হয়েছিল, যার সাহায্যে এইসব অমঙ্গলপ্রদ শক্তিকে শান্ত, সন্তুষ্ট, বিতাড়িত বা সংগ্রামে প্রতিহত করা যায়। তাই শ্রৌতসূত্রগুলির তুলনায় গৃহ্যসূত্রসমূহ অনেক বেশি স্পষ্টভাবে ঐন্দ্রজালিক। এটা সত্য যে সূত্র-সাহিত্য রচিত হওয়ার সময় ভারতীয়রা আদিম অবস্থা থেকে বহুদূর সরে এসেছিলেন; কিন্তু সূত্রগুলি বহু সহস্র বৎসরের পুরাতন বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলিকে বিধিবদ্ধ করেছে মাত্র। জীবনের প্রতি প্রাগ-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অতিপ্রাকৃতিক স্তরে মানুষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সংগ্রাম করতে প্ররোচিত করেছে।

রচনা পরিচয় (গৃহ্যসূত্র)

ঋগ্বেদের সাতটি গৃহ্যসূত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে; পরবর্তী সাহিত্যে উল্লিখিত হওয়ার আমরা এদের নাম জানতে পেরেছি : শৌনক, শাকল্য, ঐতরেয়, বহ্বৃচ, ভারবীয়, পরাশর ও পৈঙ্গি। ঋগ্বেদের দুটিমাত্র গৃহ্যসূত্র–শাঙ্খায়ন ও আশ্বলায়ন আমাদের কাছে পৌঁছেছে। শুক্লযজুর্বেদের গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যেও দুটি এখন পাওয়া যায় : বাজসনেয় ও পারস্কার ('কার্ষীয়' নামেও পরিচিত– কাত্যায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত); 'বাজবাপ' বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে কৃষ্ণ যজুর্বেদের ন'টি গৃহ্যসূত্রের সবগুলি আমরা পেয়েছি। এদের মধ্যে ছ'টি তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত : বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী সত্যাষাঢ়, বৈখানস ও অগ্নিবেশ। অবশিষ্ট তিনটি মৈত্রায়ণ শাখার অন্তর্গত : মানব, কাঠক (বা লৌগাক্ষি) ও বারাহ। সামবেদের সঙ্গে চারটি গৃহ্যসূত্র

সংশ্লিষ্ট : গোভিল, জৈমিনীয়, খাদির (দ্রাহ্যায়ণ নামেও পরিচিত) এবং কৌথুম। শেষোক্ত গ্রন্থের সামান্য কিছু অংশমাত্র পাওয়া যায়; এই গুলি বিশ্লেষণ করে। মনে হয়, একে যথার্থ গৃহ্যসূত্র অপেক্ষা 'পদ্ধতির প্রকৃতি যুক্ত সহায়ক শ্রেণীর রচনা বলাই সঙ্গত। অথর্ববেদের কৌশিক সূত্র মিশ্রশ্রেণীর রচনা—শ্রৌতসূত্র পর্যায়ে আমরা ইতিমধ্যে এর আলোচনা করেছি।

রচনাকাল (গৃহ্যসূত্র)

রচনাকাল অনুযায়ী প্রধান গৃহ্যসূত্রগুলিকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম ভাগে রয়েছে : আশ্বালায়ন, গোভিল, বৌধায়ন, মানব ও কৌথুম। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে : ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, শাখায়ন, কাঠক ও পারস্কার। তৃতীয় বা শেষ স্তরে রয়েছে : সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশী, জৈমিনীয়, খাদির ও দ্রাহ্যায়ণ। এইসব সূত্রের যথাযথ রচনাকাল নির্ণয় প্রায় অসম্ভব; বিষয়বস্তু অর্থাৎ গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানসমূহ কোনো বিস্মৃতি যুগের ধূসর অতীতে উদ্ভূত হয়েছিল। এইসব অনুষ্ঠান পালনের বিধিসমূহ সাংকেতিক সূত্রে চূড়ান্তভাবে গ্রথিত হওয়ার পূর্বে অসংখ্য প্রজন্মের মধ্য দিয়ে পরিশীলিত হয়েছিল। আমাদের মনে হয়, সূত্রগুলি খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে খ্রিস্টীয় ২০০ অব্দের মধ্যে সংগৃহীত ও বিধিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু (গৃহ্যসূত্র)

কয়েকটি প্রধান গৃহ্যসূত্র পরীক্ষা করে আমরা এদের বিষয়বস্তু প্রকৃতি ও বিশেষ চরিত্রলক্ষণ সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। ভি . এম. আপ্‌টে গৃহ্য

অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহকে পাঁচটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন : (ক) ধর্মানুষ্ঠানসংশ্লিষ্ট : এ-ধরনের মন্ত্রই সূত্রসাহিত্যে সর্বাধিক পাওয়া যায়—যার অধিকাংশ বিবাহ ও পারলৌকিক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হত। (খ) দেব-আহ্বানসূচক : এখানে অনুষ্ঠানের আয়োজকের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে। (গ) দেবকাহিনীবিষয়ক : এখানে প্রার্থনা অপেক্ষা কোনো দেবতা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রত্নকথা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। (ঘ) আহুতিসংক্রান্ত : এখানে অনুষ্ঠান অপেক্ষাও আহুতির উপর তৎসম্পর্কিত মন্ত্রের প্রভাব বেশি। (ঙ) আকস্মিক : এধরনের মন্ত্রের ক্ষেত্রে কিছু বিক্ষিপ্ত শব্দ বা বাক্যাংশ ছাড়া অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগসূত্র থাকে না।

এই বিশ্লেষণ থেকে গৃহ্যসূত্রগুলিতে অভিব্যক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা সম্পর্কে আমরা অবহিত হই : ক্রমশ মন্ত্রসমূহ তাদের যথার্থ বৈদিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এর দুটি কারণ বলা যেতে পারে : (ক) একটি নতুন যৌগিক প্রত্নপৌরাণিক ধর্মের উদ্ভবের ফলে বৈদিক যজ্ঞধর্মের ক্রমিক অবনতি এবং (খ) প্রাচীনতর। ঐতিহ্যের সঙ্গে কাল্পনিকভাবে হলেও সূক্ষ্ম একটি যোগসূত্র রক্ষা করার জন্য প্রাচীন মন্ত্রসমূহের উষ্চারণ মনস্তাত্ত্বিক কারণে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়া। বর্তমান ভারতীয় সমাজে সম্পূর্ণত পৌরাণিক গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান পালিত হওয়ার মধ্যে এই প্রবণতা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাই আয়োজিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না। থাকা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত মুখ্যত বৈদিক মন্ত্রই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আশ্বালায়ন চারটি অংশে বিভক্ত; প্রথম অংশে গার্হাপত্য অগ্নি প্রজ্বলনের বিধি এবং আর্যজীবনে গর্ভাধান থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত অনুষ্ঠানসমূহ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে নির্দিষ্ট সময়নির্ভর অনুষ্ঠান : যেমন, প্রধানত বর্ষাকালীন সর্পের বিরুদ্ধে আয়োজিত শ্রাবণ-

যাগ এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শীতকালে করণীয় অষ্টকা ও অন্বষ্টক্য-যুক্ত আশ্বযুজ। তাছাড়া রথারোহন ও তিনটি উচ্চতর বর্ণের গৃহনির্মাণের উপযোগী অনুষ্ঠানসমূহ এই অংশে বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় অংশে রয়েছে বিবিধ বিষয়বস্তু; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : গৃহস্থদের পঞ্চবিধ অনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, লোকায়ত ধর্মবোধের উপাদান, ঋষিদের তালিকা, কাম্যেষ্টি, অশুভ-লক্ষণ ও তাজনিত প্রায়শ্চিত্ত, ছাত্রাবস্থা ও স্নাতকের আচারবিধি ইত্যাদি। বিশেষত এখানে রচনাটির অর্বাচীনতার লক্ষণ পরিস্ফুট। শেষ অংশে রয়েছে রোগ, মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনা, সপ্তবিধ শ্রাদ্ধ এবং প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির জন্য রুদ্রের প্রতি নিবেদিত বিশেষ অনুষ্ঠান।

ত্রিশটি কণ্ডিকায় বিন্যস্ত আশ্বলায়ন-গৃহপরিশিষ্ট মহাকাব্যিক ছন্দে গ্রথিত পবরতীকালের সম্পূরক রচনা। এর ব্যাকরণ, ছন্দ ও পদাঘাােয়রীতি ত্রুটিপূর্ণ; ছন্দোগত বিচ্যুতি-পূরণের জন্য অব্যয় বারেবারে প্রযুক্ত হয়েছে। গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত ঋগ্বেদীয় মন্ত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করা ও প্রয়োগপদ্ধতির ভাষ্য রচনা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ঋগ্বেদের অপর গৃহ্যসূত্র, অর্থাৎ শাখায়ন, বাষ্কল শাখার অনুগামীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। লেখকের নাম হিসাবে সুযজ্ঞ শাঙ্খায়ন উল্লিখিত হয়েছেন; তবে গ্রন্থকর্তারূপে নিম্নোক্তদের নামও পাওয়া যায় : কৌষীতকি, মহাকৌষীতকি, ঐতরেয়, মহৈতরেয়, আশ্বলায়ন ও কহাােল। প্রথম অধ্যায় অষ্টকা, শ্রাবণী, আগ্রহায়ণী, চৈত্রী, আশ্বযুজী ও নির্দিষ্ট সময়ে আয়োজিত শ্রাদ্ধসমূহ–এই সপ্তবিধ পাকযজ্ঞ বিবৃত হয়েছে। প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হলো শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের পদ্ধতি ও আমন্ত্রণযোগ্য অতিথি। ক্রমশ বিবাহ অনুষ্ঠান, গর্ভাবস্থা, জন্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠান, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ইত্যাদিও

আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন ও বিদ্যার্থীদের আচরণ-বিধি বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে গৃহনির্মাণ পদ্ধতি, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। চতুর্থ অধ্যায়ে উপকরণ, অনধ্যায় ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। তারপর গুরুর প্রতি কৃত অন্যায় ও তজ্জনিত প্রায়শ্চিত্ত বর্ণনা-প্রসঙ্গে ঋষিদের বিভিন্ন বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে। এই তালিকায় ব্যাসের চারজন শিষ্য উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয়, আলোচ্য গৃহ্যসূত্র মহাভারতের চূড়ান্ত রচনাপর্বের সমকালীন। পুরুষ ঋষিদের সঙ্গে গার্গী বাচক্লবী, বড়বা আতিথেয়ী ও সুলভা মৈত্রেয়ীর মতো ঋষিকাও এতে উল্লিখিত হয়েছেন। তাছাড়া দেবগৃহে প্রদক্ষিণের বিধি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তখন মন্দির ও দেবপ্রতিমা প্রদক্ষিণ করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। শ্রাবণ আহুতিতে বিভিন্ন লোকের সর্পের উল্লেখ লক্ষণীয়। পরিশেষে রয়েছে বিভিন্ন ঋতুর অনুষ্ঠান ও রুদ্রহােম।

পঞ্চম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে বৈশ্বদেব, প্রায়শ্চিত্ত এবং কূপ, দীঘি ও উদ্যান শুদ্ধকরণের অনুষ্ঠান এবং পরিশেষে অশুভ লক্ষণ, ব্যাধি ও বিবিধ প্রয়োজনীয় আচারসহ প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুষ্ঠানের বিবরণ। শেষ অধ্যায়ে স্বাধ্যায় বা বেদাধ্যয়নের বিষয়বস্তুরূপে আরণ্যক হোমের নির্দেশাবলী এবং সেই সঙ্গে কমবিরতির তালিকা ও বেদমন্ত্র আবৃত্তির পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রে বিষয়সূচী খুব সামান্যই পরিবর্তিত হয়; শুধুমাত্র গুরুত্বআরোপের ক্ষেত্রে এদের পারস্পরিক ভিন্নতা নিরাপিত হতে পারে। শুক্ল যদুর্বেদের পারস্কার গৃহ্যসূত্র প্রকৃতপক্ষে কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের পরিশিষ্ট; তাই তা 'কাতীয়' নামেও পরিচিত। এর তিনটি অংশ কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অংশের সূচনায় রয়েছে গার্হাপত্য অগ্নি প্রজ্বলনের প্রস্তুতি, ও

অতিথি-আপ্যায়নের পদ্ধতি। লক্ষণীয়, বলা হয়েছে অতিথির উপযুক্ত খাদ্য হল গোমাংস। তারপর পাকযজ্ঞ ও বিবাহসংক্রান্ত বিভিন্ন অনুপুঙ্খ বর্ণিত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের প্রাধান্য তর্কাতীত; সপ্তপদী অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথাও–প্রত্নকথা বা অনুষ্ঠানের গঠনের পিছনে প্রধান প্রেরণাদায়ী ভূমিকা যে লোকায়তা লঘু ঐতিহ্যের অনুষ্ঠানবিধির ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জন্মবিষয়ক অনুষ্ঠানের বহু অবৈদিক জনপ্রিয় দেবতাকে আহ্বান করা হত, যাদের নাম এইখানেই প্রথমবার শোনা গেলো। ষণ্ড, মর্ক, উলূখলের মতো ব্রাহ্মণ্য উপদেবতা ছাড়াও এদের রয়েছে মলিম্লুচ, দ্রোণাশ, চ্যবন, আলিখৎ, অনিমিষ, কিংবদন্ত উপশ্রুতি, হর্যক্ষ, কুন্তী, শত্রু-হন্তমুখ ও সর্ষপারুণ। লঘু ঐতিহ্যের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের বিস্তর ইঙ্গিত মেলে এই নামগুলিতে।

দ্বিতীয় অংশে রয়েছে শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ ভোজনের বিধি, উপনয়ন, বেদধ্যয়ন, অন্যধ্যায়, প্রায়শ্চিত্ত, হলকর্ষণ, বিভিন্ন ঋতুর উপযুক্ত যজ্ঞ ইত্যাদি। তৃতীয় অংশে প্রাগুক্ত যজ্ঞসমূহের বিবরণ ছাড়াও রয়েছে শ্রাদ্ধ, গৃহনির্মাণ, শিরঃপীড়ার উপশম, ভৃত্যের পলায়ন রোধের জন্য ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান, রুদ্রের প্রতি রক্তের আহুতিপূর্ণ অনুষ্ঠান–এই সম্পূর্ণ অভিনব আচরণে সম্ভূত প্রত্ন-তান্ত্রিক ধর্মের উপাদান অভিব্যক্ত হয়েছে। তারপর বিভিন্ন ধরনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ, পশুযাগ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। দেবতার পক্ষে অনুকূল পবিত্র স্থানের ধারণা বৈদিক যুগের প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় নি; এখানে তার প্রকাশ ঘটায় একে আমরা প্রত্ন-পৌরাণিক যুগের লক্ষণ রূপে গ্রহণ করতে পারি, যখন বিভিন্ন পবিত্র বন, বৃক্ষ, নদী ইত্যাদির কল্পনা ক্রমশ লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে; তাছাড়া মন্দির ও প্রতিমার ধারণা এ সময়ে দেখা দেয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিচারালায়, রণ; পববর্তী দুটি অধ্যায়ে রথ বা হস্তী আরোহন ও বিভিন্ন দেবতার আহ্বান এবং ষোড়শ অধ্যায়ে জনৈক বৈদিক বিদ্যার্থীর মর্মাস্পর্শী প্রার্থনা ব্যক্ত হয়েছে।

পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত ঋগ্বিধান গ্রন্থটি অর্বাচীনতর সূত্র-জাতীয় রচনা। এর একমাত্র বিষয়বস্তু হল ইন্দ্রজাল এবং প্রধান উদ্দেশ্য, ঋগ্বেদীয় মন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক প্রয়োগবিধির নির্ধারণ। মহাকাব্যিক অনুষ্টুপ ছন্দে গ্রন্থের অধিকাংশই রচিত। যদিও লেখকরূপে শৌনকের নাম উল্লেখ করা যায়, তবুও এই গ্রন্থে দীর্ঘ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত রচয়িতাদের প্রচেষ্টার নিদর্শনও রয়েছে। ঋগ্বেদের সঙ্গে এর যোগাযোগ ক্ষীণ ও কৃত্রিম, কেননা কোনো প্রকৃত আন্তরিক প্রয়োজন বা প্রাসঙ্গিকতা ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহ প্রেতিনিবারণ, অশুভলক্ষণ-দূরীকরণ, অভিচার ও অন্যান্য ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে—মূল লক্ষ্য বা প্রয়োগের সঙ্গে যেগুলির পার্থক্য মৌলিক। এদিক দিয়ে সামবিধানের সঙ্গে এর নিবিড় সাদৃশ্য বয়েছে; কেননা তা ব্রাহ্মণরূপে অভিহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর রচনা নয়। তেমনি কৌশিকসূত্র বা ঋদ্বিধানকেও প্রকৃত গৃহ্যসূত্র বলা যায না, এরা নিববয়ব প্রত্নপৌরাণিক ধর্মীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ঋশ্বিধানের শেষ অংশে রয়েছে। ফলশ্রুতি বা রচনা-মাহাত্ময়া পরবর্তী ধর্মীয় সাহিত্য, বিশেষত মহাকাব্য ও পুরাণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এতে যে সমাজ চিত্রিত হয়েছে তা ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের নিয়ন্ত্রণে—যারা শুধুমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠানই করতেন না, কল্যাণ ও অকল্যাণপ্রদ ঐন্দ্রজালিক মনুষ্ঠানেও নিরত থাকতেন। তারা নানাবিধ প্রেত ও লোকদেবতাকে আহ্বান জানাতেন; পদ্মফুল, চন্দন, তৈল, লবণ, বিল্বপত্র ও শালগ্রাম শিলার সাহায্যে পূজা করতেন। ভক্তি, মন্দির, প্রতিমা, কৃচ্ছসাধন, যোগ, জপ, উদ্ভিজ্জ আহুতি দিয়ে পূজা, রক্ষাকবচ, ন্যাস, প্রতিমূর্তির ঐন্দ্রজালিক অঙ্গচ্ছেদ, আতিশয্যের প্রবণতা—এ সমস্তই বেদোত্তর হিন্দু ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত সাহিত্যের চরিত্রলক্ষণ। আহুত দেবতাদের অধিকাংশই পৌরাণিক, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবীয় ধারার অন্তর্গত : এমন কি, এসমস্ত সম্প্রদায়ে প্রচলিত পূজাপদ্ধতিও প্রাধান্য পেয়েছে। জাতিভেদপ্রথা দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে; এ-

পর্যায়ে পুরোহিতদের দক্ষিণার বৈচিত্র্য ও পরিমাণ বহুগুণ বর্ধিত যেহেতু ইতোমধ্যে তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে অনতিক্রম্য হয়ে উঠেছিল।

ঋগ্বিধানের বিলম্বিত আত্মপ্রকাশ শুধুমাত্র বহু পৌবাণিক বিষয়বস্তু, অর্চনাপদ্ধতি ও অচিত বস্তুর অন্তর্ভুক্তির মধ্যেই প্রমাণিত নয়—মূল বৈদিক সমাজ থেকে এর প্রচুর দূরত্বের মধ্যেও এই তথ্য অভিব্যক্তি। অধ্যাত্মভাবনায় নিষ্ণাত ঋগ্বেদের 'অস্যবামীয়' সূক্তকে এখানে পাপমোচনের জন্য আবৃত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; তেমনি বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শুনঃশেপ উপাখ্যান আবৃত্তি করার যান্ত্রিক নির্দেশ লক্ষ্য করা যায়। রতি, প্রদ্যুম্ন, কেশব, মাধব, গোবিন্দ, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদরের মতো দেবতারা শুধু পৌরাণিক দেবতার অস্তিত্বই প্রমাণ কবে না, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থকে বৈদিক ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের অন্তর্বর্তী তাৎপর্যপূর্ণ যোগসূত্ররূপে যথাযথভাবে গ্রহণ করা সমীচীন। আরো কয়েকটি অর্বাচীন গৃহসূত্রের সঙ্গে এই গ্রন্থটি আমাদের নিকট নিশ্চিতভাবে যুগসন্ধিক্ষণের লক্ষণসমন্বিত প্রত্নপৌরাণিক ও প্রাক-হিন্দুযুগের ধর্মীয় কাঠামোটি তুলে ধরে—আপন অবৈদিক কাঠামো আবৃত করার জন্যই মাকে বৈদিক পরিচ্ছেদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, উন্নতিশালী যে বণিক সম্প্রদায় তৎকালীন অর্থনীতি ও ফলত কিছু কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতাও নিয়ন্ত্রণ করত, তারা সে-যুগের প্রধান ধর্মীয় প্রবণতাগুলিরও নিয়ামক হয়ে উঠেছিল। এই বণিক সম্প্রদায় যে অরক্ষণশীল অথবা অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের সঙ্গে বিশেষ ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল-তা তাদের ক্রমোন্নতির ইতিহাস থেকেই স্পষ্ট; এছাড়া কিছু কিছু লোকদেবতার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিল।

তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত অগ্নিবেশ্য গৃহ্যসূত্র বাধূল শাখার উপবিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত। রচনাটি তিনটি প্রশ্নে বিন্যস্ত হয়েছে। এদের মধ্যে পুংসবন থেকে সন্ন্যাস পর্যন্ত সবগুলি গৃহ্য অনুষ্ঠান বিবৃত হয়েছে। শেষ প্রশ্নে রয়েছে বিবিধ বিষয়বস্তু : শ্রাদ্ধ এবং গর্ভবতী ও সংসার-পরিত্যাগীর জন্য অনুষ্ঠান ছাড়াও নারায়ণ-বলি'র মতো পিতৃপুরুষের উদ্দেশে আয়োজিত অনুষ্ঠান ও শিকল-হােমের মতো গৌণ আচারও এতে রয়েছে। আবার এই গ্রন্থে বিবৃত কয়েকটি অনুষ্ঠান অন্য কোথাও পাওয়া যায় না : 'স্থাগরালঙ্কার' নামক বিচিত্র অনুষ্ঠানে আটটি বস্তু ব্যবহৃত হতমালাবার অঞ্চলে এটি সাধারণত 'অষ্টমাঙ্গল্য' নামে পরিচিত এবং বঙ্গদেশে অনুষ্ঠিত একটি আচারের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট। অনেকটা তান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত দেবতারাধন অংশে 'যন্ত্রী' উল্লিখিত হলেও প্রতিমার কোনো উল্লেখ নেই–সম্ভবত তা পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল। বোধায়ন, কুশহারাােত, পুষ্করসাদি ও কৌষীতকি–এই চারজন শিক্ষকের নামও উল্লিখিত হয়েছে।

অগ্নিবেশ্য গৃহ্যসূত্রকে অর্বাচীন রচনা বলে মনে হয়; বৌধায়ন শাখার সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে-সম্ভবত তা এর বিকল্প পাঠান্তর। মহাকাব্যিক অনুষ্টুপ ছন্দে দীর্ঘ স্তবকগুলি রচিত হওয়ার মধ্যে এর নবীনতা স্পষ্ট; তবে এই শ্লোকগুলি পরবর্তীকালের সংযোজনও হতে পারে। এমন কি, প্রাচীন সূত্র আঙ্গিকে রচিত অংশ অপেক্ষা এর গদ্যাংশ অনেক বেশি সম্পূর্ণতর। যদিও রচনার মধ্যে বেশ কিছু অপাণিনীয় শব্দ ব্যবহার রয়েছে, তবু এর ভযাকে খুব একটা প্রাচীন বলা যায় না।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র দুটি প্রশ্নে বিন্যস্ত-প্রতি প্রশ্ন আটটি পটলে বিভক্ত। প্রথম প্রশ্নে বিবৃত উপনয়ন উৎসবে আমবা 'শাক' ও 'জঞ্জভ' নামে দুটি নূতন গ্রহের কথা জানতে পারি। ঐন্দ্রজালিক আচার সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ অংশের পরে বিবাহ অনুষ্ঠান আলোচিত হয়েছে।

এছাড়া রয়েছে দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ আকস্মিক দুর্ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে আচার ও ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান। গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মাতাপিতার প্রতি বিদ্যার্থীর কর্তব্য ও বিবাহের পর গার্হস্থ্য আশ্রমের সূচনা এবং তদপযোগী প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে। প্রার্থিত বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের মধ্যে সেযুগের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির নিদর্শণ পাওয়া যায়। এছাড়া প্রথম প্রশ্নে রয়েছে যজ্ঞাগ্নির প্রজ্জ্বলন ও গৃহনির্মাণ। দ্বিতীয় প্রশ্নের সূচনা হয়েছে জন্মপূর্ববর্তী অনুষ্ঠান দিয়ে; তারপর জন্মকালীন অনুষ্ঠান, নামকরণ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। শিশুর একটি গোপন নামের ব্যবস্থায় আদিম মানুষের মানসিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত রহস্য ও ঐন্দ্রজালিক চেতনা অভিব্যক্তি। কৈশোরকালীন অনুষ্ঠানগুলির পরে আচারগত বিচ্যুতি ও তজনিত প্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত হয়েছে। বিবিধ সারমেয়-দানবের মধ্যে যে ‘দুলা’ নামটি পাওয়া যায়, তা ছ’জন কৃত্তিকার অন্যতমা এই নামেরই অধিকারিণী। তৎপরবর্তী অনুষ্ঠান ‘শূলগব’-এ বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে চন্দন উল্লিখিত হওয়ায় দক্ষিণ্যত্যের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক আভাসিত হয়েছে, যেহেতু কেবলমাত্র সেই অঞ্চলেই চন্দন বৃক্ষ দেখা যায়। রুদ্রের পানীয়রূপে সুরা ইত্যাদি নির্দেশিত হওয়ায় আমাদের মনে হয় এর অন্তরালে রয়েছে কোনও আদিম লৌকিক দেবতা বা অশুভ আত্মার উপস্থিতির প্রভাব। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের একটি বিচিত্র প্রার্থনায় যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিথিলতার ইঙ্গিত রয়েছে। অষ্টকা অনুষ্ঠানে পিতৃপুরুষের প্রতি গোমাংস নিবেদিত হয়েছে। একে একে শ্রাবণ অনুষ্ঠান, স্নাতক অনুষ্ঠান, প্রাচীন শিক্ষকদের তালিকা এবং জ্বর, ক্রোধ, ধর্ম প্রভৃতি বিশুদ্ধ বিমূর্ত বস্তুর সঙ্গে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, বাজশ্রব, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ ও কাশীশ্বর প্রভৃতি বশিষ্ঠ ও পরাশর দ্বারা উল্লিখিত হয়েছেন। অধ্যয়নের বিষয়সমূহের মধ্যে ইতিহাস ও পুরাণ উল্লিখিত হওয়ায় আলোচ্য গ্রন্থ যে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। পদপাঠের রচয়িতারূপে আত্রেয়া, ভাষ্যকাররূপে কৌণ্ডিণ্য ও সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশীর উল্লেখ এবং অরণ্যবাসী মুনি, শিক্ষক ও ব্যতিদের

বর্ণনা এবং একপত্নীক ব্যক্তিদের প্রশংসা থেকে তৎকালীন সমাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে কতকটা ধারণা করে নেওয়া হয়েছে।

খাদির গৃহ্যসূত্র দ্রাহ্যায়ণ নামেও পরিচিত; এর পাঁচটি পঙ্কিক প্রত্যেকটি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। এতে কয়েকটি নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে যেমন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের যথাযথ সময় ও ক্রিয়াপদ্ধতি, গৃহের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান এবং সমৃদ্ধিকামী ব্যক্তির আচরণীয় ক্রিয়া। হাোতা ও ব্রহ্মাশ্রেণীর পুরোহিতদের ক্রিয়াকর্মকে সংযুক্ত করার জন্য প্রদত্ত একটি নির্দেশ আমরা সেই যুগের অভিব্যক্তি দেখি যখন একজন মাত্র পুরোহিত যজ্ঞ সমাধা করতেন। যজ্ঞ সম্পর্কিত কিছু কিছু নির্দেশ থেকে বিলাসী সমাজের চিত্র পাওয়া যায়।

সামবেদের গোভিল গৃহ্যসূত্র কৌথুম শাখার মন্ত্র-ব্রাহ্মণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। চারটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত এই গ্রন্থটি কয়েকটি কণ্ডিকায় বিভক্ত; তবে এই বিভাগ নিতান্ত কৃত্রিম। যদি প্রতি ভাগকে একটি দিনের পাঠরূপে গ্রহণ করা যায়, শুধুমাত্র তা হলেই এর অর্থবোধ হতে পারে। প্রধানত সূত্রশৈলীর গদ্যে রচিত এই গ্রন্থে অল্প কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া যায়। স্নান, শ্রাদ্ধ ও সান্ধ্য অর্চনা সম্পর্কিত আরো পাঁচটি গ্রন্থের রচয়িতা রূপে গোভিলের নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে। গোভিল গৃহসূত্রে বিষয়বস্তুর অনুরূপ; শুধু সামমন্ত্র গায়ক ছাত্রের উপর অধিকতর গুরুত্ব এখানে আরোপিত হয়েছে। পক্ষিমাংস ভক্ষণ তার পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়ায় মনে হয়, এটি সহানুভূতিনিষ্ঠ ইন্দ্রজালের প্রতি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত-সুরশিক্ষার্থীর পক্ষে সুরস্রষ্টা জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতাকে নিরস্ত করার অভিপ্রায়েই এ নির্দেশ পরিকল্পিত। গোভিলপুত্র রচিত গৃহ-সংগ্রহ প্রকৃতপক্ষে গোভিল গৃহ্যসূত্রের পরিশিষ্ট এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন নির্বাহ করার জন্য তা পরিকল্পিত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গার্হাপত্য অগ্নি যে ছত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন নাম

পরিগ্রহ করে, তার বিবরণ দিয়ে এই গ্রন্থের সূত্রপাত; এই অগ্নিতে আহুতিদানের তাৎপর্য মহত্ব ও তার যথার্থ পদ্ধতি এবং উপযুক্ত ইন্ধন প্রয়োগের উপর এখানে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। প্রধানত যে সমস্ত বিষয় এই রচনায় আলোচিত, তার মধ্যে রয়েছে—আনুষ্ঠানিক আসনভঙ্গি, যজ্ঞবিষয়ক দেবতার পবিত্রতা, কুশ-ব্যবহারের উপযুক্ত ক্ষেত্র, আনুষ্ঠানিক স্নান, সুরার ব্যবহার, বালিকাদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স, উপনয়ন, আহুতি প্রদান, শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণভোজন আনুষ্ঠানিক অশুচিতা ও তার প্রতিবিধান, স্বকীয় বৈদিক শাখার প্রতি আনুগত্য এবং তদভাবে অনৌচিত্য ইত্যাদি।

লৌগাক্ষি গৃহ্যসূত্র (কাঠক, চরক ও চারায়ণীয় নামেও পরিচিত) কৃষ্ণ যজুর্বেদের কাঠক শাখার অন্তর্গত এবং মহাকাব্যিক শৈলীতে এর শ্লোক সমূহ রচিত হওয়ায় মনে হয়। এটি পরবর্তী কালের গ্রন্থ। বিষয়বস্তুর বিন্যাসে কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ছাপ নেই। মানব ও বারাহ গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে এই গ্রন্থের প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। সাধারণত অন্যান্য গৃহ্যসূত্রে যে সমস্ত বিষয়-বস্তু পরিলক্ষিত হয়, লৌগাক্ষি গৃহ্যসূত্রেও সেসব পাওয়া যায়। তবে নববধূর শুদ্ধীকরণ ও বধূবরণ অনুষ্ঠানের উপর এতে কিছু গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে; এছাড়া দেবপূজায় প্রযুক্ত পবিত্র সঙ্গীতও কিছু গুরুত্ব পেয়েছে। যোগ্য ছাত্রদের তালিকায় ধনদাতা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্পষ্টত এই তথ্য আভাসিত হচ্ছে যে ইতোমধ্যে শিক্ষাজগতেও কিছু পরিমাণে বাণিজ্যিক মনোভাব সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। বৈদিক বিদ্যার পক্ষে উপযুক্ত অন্যবিধ ব্যক্তিরূপে শিক্ষকের জন্য কায়িক পরিশ্রমে নিরত কর্মকৃৎ নির্দেশিত হয়েছে। বালিকাদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স ছিল দশ বা বারো; কুমারীদের জন্য দুটি বিশেষ উৎসব ছিল ‘রাকা’ ও ‘হালেকা’। গার্হস্থ্য অঙ্গল মোচনের জন্য পরিকল্পিত বিভিন্ন সাময়িক অনুষ্ঠান, রাক্ষস, মুষিক ও কপোতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হত। পিণ্ডপিতৃ যজ্ঞ নামক পিতৃপুরুষের উদ্দেশে নিবেদিত

অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত অন্ন দিয়ে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হত। এই শেষোক্ত অনুষ্ঠানটি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও এইরূপ ব্রাহ্মণদের সমাজে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হয়, কারণ সম্ভবত এরা প্রাচীনতর কালেও সামাজিকভাবে হেয় ছিলেন। যেসব অমঙ্গল প্রদ অপশক্তিকে বিতাড়নের চেষ্টা করা হয়, তাদের মধ্যে অধিকাংশ নাম অন্যান্য গৃহ্যসূত্রে পাওয়া গেলেও চুপনী—এই নূতন নামও পাওয়া যায়। ছয়জন কৃত্তিকার অন্যতম চুপুনিক নামটির উৎস এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত রয়ে গেছে!

তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র চারটি প্রশ্নে বিন্যস্ত; এদের মধ্যে প্রথমটির বিবাহক্রিয়া দিয়ে শুরু এবং গর্ভাবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির চূড়ান্ত রূপটি দিয়ে সমাপ্তি। দ্বিতীয় প্রশ্নের শুরুতে রয়েছে জন্মকালীন অনুষ্ঠান এবং ক্রমে ক্রমে এতে বাল্যবস্থা বেদাধ্যয়ন ও গার্হস্থ্যসংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলি আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় প্রশ্নে বিবৃত হয়েছে বিবিধ আনুষ্ঠানিক বিচ্যুতি ও প্রায়শ্চিত্ত, সর্প ও অন্যান্য উপদেবতার শাস্তিবিধান এবং কল্যাণ-বিধানের জন্য কিছু কিছু অনুষ্ঠান। শেষ অধ্যায়ে বিবিধ আকস্মিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী কথিত হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে ভাবী অমঙ্গলসূচক লক্ষণ এবং তৎপ্রসূত অমঙ্গল নিবারণের উপযোগী অনুষ্ঠান সমূহ। রচনার প্রধান অংশের পরে যে পরিভাষা অংশটি রয়েছে তাতে আনুষ্ঠানিক মান, শুভদিন ও গৃহস্থের পক্ষে অবশ্য পালনীয় পঞ্চবিধ অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী বিবৃত হয়েছে। এর পরবর্তী অংশটি গৃহ্যশেষ রূপে অভিহিত; যে-সমস্ত বিষয় পূর্বসূরীদের রচনায় যথাযথভাবে আলোচিত হয় নি, এতে সে-সব স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে বিষ্ণু, রুদ্র, দুর্গা, রবি, জ্যেষ্ঠ, বিনায়ক, ঈশান প্রভৃতি দেবতার প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠার এবং নারায়ণের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদনের নিয়মাবলী-এই অংশে আমরা পৌরাণিক যুগের প্রাথমিক পর্বে প্রবেশ করেছি। পিতৃমেধ ও পিতৃমেধ-শেষ সম্পর্কে বৌধায়ন রচিত আরো দুটি সম্পূরক রচনার

সন্ধানও পাওয়া যায়। তেইশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এর পার্থক্য খুব সামান্য—তবে গার্হাপত্য অগ্নিপ্রজালন এবং নববধূর সঙ্গে সম্পর্কিত অনুষ্ঠান-সমূহের উপর এতে অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। অপর স্ত্রী গ্রহণ করা থেকে স্বামীকে নিবৃত্ত করার জন্য এবং স্বামীর মন আকৃষ্ট করার জন্য পত্নী কর্তৃক পালনীয় অনুষ্ঠানও এখানে রয়েছে। বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত হওয়ার পর বরকে একটি গোদান করে তবে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হত। বন্ধু ও বরের মধ্যে শুভ ও অশুভসূচক লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টায় লোকায়ত বিশ্বাসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানে ইন্দ্রজালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অষ্টকা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে গোমাংস অর্পিত হওয়ায় মনে হয় গোমাংস ভক্ষণ সম্পর্কে সামাজিক নিষেধ তখনও পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। তুলনামূলকভাবে নুতন দেবতারূপে ঈশানকে কেন্দ্র করে পৃথক চর্যবিধি যে গড়ে উঠেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্পূরক রচনা অর্থাৎ গৃহ্যাশেষে আমরা একটি বিশেষ ধরনের চেষ্টায় সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি যেখানে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের সীমাকে নূতন যুগের ধর্মবোধে প্রসারিত করে ক্রমোন্নতিশীল পৌরাণিক পূজাপদ্ধতিকে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া দেখা যায়। এই গৃহ্যাশেষ ছাড়াও আমরা একটি আপস্তম্ব গৃহ্যপরিশিষ্টের সন্ধান পাই যা আপস্তম্ব শাখার গৃহ্য অনুষ্ঠান-বিষয়ক রচনার পদ্যে গ্রথিত ও পরবর্তীকালে প্রণীত পরিশিষ্ট। বধূসম্প্রদানের সময় বধু ও বরের মাতামহ ও পিতামহের নাম আমরা উল্লিখিত হতে দেখি কিন্তু তাদের মাতামহী ও পিতামহীর নাম উল্লিখিত হয় না–এটি পূর্ণবিকশিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারই নিদর্শন। ইতোমধ্যে গ্রহগুলি দেবতায় পরিণত হয়ে পূজা পেতে শুরু করেছে। গ্রহগুলি প্রতিমারূপে পূজিত হত; প্রত্যেক প্রতিমার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাপ ছিল এবং গোষ্ঠীগত অবস্থানে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ভূমিকাও ছিল সুপরিমিত। রাজা ও ব্রাহ্মণের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, তারা উপাসকদের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিয়ে থাকেন এবং অবজ্ঞাকারীদের বিনাশ করেন। কূপ

ও পুষ্করিণী খননের মত মূর্তিকর্ম সম্পর্কে যে সমস্ত নিয়ম বিবৃত হয়েছে— তার মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণদের বিপুল দক্ষিণা ও ভোজ্যদ্রব্য অর্পণের নির্দেশ। এছাড়া এতে স্বাধ্যায় সম্পর্কিত যেসব নির্দেশ রয়েছে, তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ইতিমধ্যে উপনিষদের জনপ্রিয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানব গৃহ্যসূত্র কৃষ্ণ যদুর্বেদের মৈত্রায়ণীয় শাখার অন্তর্গত। এর দুটি খণ্ড আবার পঁয়তাল্লিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। ছাত্রাবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি এখানে সানুপুঙ্খ আলোচিত হয়েছে এবং এই অনুষ্ঠানগুলি দিয়ে গ্রন্থ সূচনা হওয়ার পর গার্হস্থ্য জীবনের সূচনা যে বিবাহ অনুষ্ঠান তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। শেষ অংশে বিভিন্ন ঋতুকালীন যজ্ঞ এবং দৈবদুর্বিপাকের সঙ্গে সম্পর্কিত অনুষ্ঠান বিবৃত হয়েছে। আরো কয়েকটি গৃহ্যসূত্রের মতো মানব গৃহ্যসূত্রেও সেই বিদ্যার্থীদের সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অংশ রয়েছে যারা উপনিষদ অধ্যয়নের পক্ষে অধিকারী। ছাত্রাবস্থায় কৃত পাপ সম্পর্কিত আলোচনায় বলা হয়েছে যে-কোনো মহাপাতকের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হল যুদ্ধে মৃত্যুবরণ। বিবাহের পাঁচটি উদ্দেশ্য কল্পিত হয়েছে; সম্পদ, সৌন্দর্য, জ্ঞান, বুদ্ধি ও সাহচর্য। যদি সবগুলি একসঙ্গে না পাওয়া যায়, তবে পূর্বোক্ত ক্রম অনুযায়ী প্রথম তিনটি বর্জন করা যেতে পারে। অতিথিকে আপ্যায়নে গোমাংস নিবেদন করা ছিল বাধ্যতামূলক; তবে গৃহস্থের কর্তব্যও ছিল অতিথিদের সঙ্গে আরো চারজন ব্রাহ্মণকে মাংস-ভোজনে আমন্ত্রণ করা। কর্ম সঙ্ঘ অনুষ্ঠানে সীতা ও রেবতী নামে দুজন নূতন দেবতা উল্লিখিত হয়েছেন। ‘বিনায়ক কল্প’ ও ‘ষষ্ঠীকল্পে’র মতো নূতন অনুষ্ঠান এই গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যায়।

তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত ভরদ্বাজ গৃহ্যসূত্র তিনটি প্রশ্ন ও সাতাশিটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। গৃহ্যসূত্রের সমস্ত প্রচলিত বিষয়বস্তু এতে আলোচিত হয়েছে; এতে রয়েছে বিবাহ, গৃহস্থের পালনীয় অনুষ্ঠান-সমূহ, বিশেষ জরুরি কিছু আচার,

প্রায়শ্চিত্ত এবং মৃত্যু, অন্ত্যেষ্টি ও প্রেতিক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠান। এই গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে বুদ্ধিমতী নারীকে বিবাহ করা উচিত এবং এই সঙ্গে উপযুক্ত পত্নী নির্বাচনের জন্য কিছু কিছু শুভ লক্ষণের তালিকাও রয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে সমস্ত শুভ লক্ষণ বর্তমান থাকলেও নিজস্ব মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী বধু নির্বাচন করা উচিত, যে স্বামীর হৃদয় এবং চক্ষু, এই দুই এর পক্ষেই প্রীতিকর হবে। তৎকালীন পরিস্থিতির পক্ষে এরূপ উদারতাপূর্ণ মনোভঙ্গীর প্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। এই ভরদ্বাজ গৃহ্যসূত্রটি প্রাচীনতর ও দীর্ঘতর গৃহ্যসূত্রগুলির অন্যতম।

মৈত্রায়ণীয় শাখার অন্তর্গত বারাহ গৃহ্যসূত্র চরক উপশাখায় বিন্যস্ত এবং সম্ভবত তা খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটি সতেরোটি খণ্ডে বিভক্ত, এদের মধ্যে প্রথমটি প্রকৃতপক্ষে মৈত্রায়ণীর সূত্রের পরিশিষ্ট। বাকি অংশসমূহে গৃহ্যসূত্রের প্রচলিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে; যেমন নবজাত শিশুর জন্য অনুষ্ঠান, দীক্ষা, বেদাধ্যয়ন ও অন্যধ্যায়-এর নিয়মাবলী বিবাহ, গর্ভবতী নারীর উপযোগী অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

বৈখানস-সূত্র অর্বাচীনতম সূত্রসাহিত্যের নিদর্শন। সাতটি প্রশ্নে বিন্যস্ত বৈখানসা গৃহ্যসূত্র আবার কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থে যথাক্রমে আনুষ্ঠানিক স্নান, এবং চতুরাশ্রমের জন্য মুখ-প্রক্ষালন, অগ্নিবিষয়ক অনুষ্ঠান, পিতৃপুরুষের উদ্দেশে অনুষ্ঠান, স্নাতক, বিদ্যার্থী ও গৃহস্থদের জন্য অনুষ্ঠান বিবৃত হয়েছে। বহু অনুষ্ঠানে অপরিচিত দেবতা বা প্রেতাত্মাকে আহ্বান জানানো হত। বাসভবন শুদ্ধীকরণের জন্য অনুষ্ঠানের পরে প্রচলিত গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানগুলি অর্থাৎ গর্ভাধান থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত ব্যাপ্ত সমস্ত আচার আলোচিত হয়েছে। শ্রাদ্ধ এবং অন্তেষ্টিক্রিয়াসমূহ এই রচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তারপর আকস্মিক দুর্ঘটনা ও অশুভ লক্ষণ নিরাকরণের উপযোগী প্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত হয়েছে; আনুষ্ঠানিক অশৌচ অবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা

এতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল। বইটির অষ্টম ক্ষেত্রে দশম প্রশ্নের নাম বৈখানস ধর্মসূত্র।

অথর্ববেদের শৌনক শাখার অন্তর্গত ‘কৌশিক সূত্র’ বা ‘সংহিতা বিধি’ একমাত্র অথর্ববেদীয় গৃহ্যসূত্ররূপে পরিচিত। এর নামকরণের মধ্যে ‘গৃহ্য’ শব্দটি উল্লিখিত হয় নি, একে শুধুই সূত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ‘বৈতানসূত্র’ নামের মধ্যে শ্রৌত কথাটি অনুল্লিখিত থাকলেও বিষয়গুলির দিক থেকে শ্রৌতসূত্ররূপে তা গৃহীত হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা নেই। কৌশিকসূত্র বিশুদ্ধ গৃহ্যসূত্র বা বিশুদ্ধ শ্রৌতসূত্র নয়–এই উভয়ের সংমিশ্রণ। অথর্ববেদ সংহিতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি অথর্ববেদীয় মন্ত্রের যজ্ঞীয় বিনিয়োগ নির্দেশ করতে চেয়েছে এবং বহুবার একই মন্ত্রের জন্য একাধিক অনুষ্ঠানের বিধান দিয়েছে। যেমন বিবাহ ও তৎসম্পর্কিত স্ত্রী-আচার, জন্মকালীন অনুষ্ঠান ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। যদিও এটি শৌনক শাখার অন্তর্গত তথাপি সূত্র সাহিত্যের অর্বাচীনতম গ্রন্থগুলির অন্যতমরূপে এটি কখনো কখনো অন্য তিনটি অথর্ববেদীয় শাখায় অর্থাৎ জলদ, জাজল ও ব্রহ্মদেব, শাখায় প্রচলিত আচার পদ্ধতির উল্লেখ করেছে। একদিক দিয়ে কৌশিকসূত্রকে আমরা অথর্ববেদ সংহিতার অনুষ্ঠানমূলক ভাষ্যরূপে গ্রহণ করতে পারি। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা হলেও এর বিষয়বস্তু অথর্ববেদের প্রাচীনতম অংশেরই সমকালীন।

গৃহ্যসূত্রের উৎস

একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক দিয়ে গৃহ্যসূত্রগুলি ব্রাহ্মণ সাহিত্য ও অথর্ববেদ থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভব হয়েছে। আর শ্রৌতসূত্রগুলি উদ্ভূত

হয়েছে শুধু ব্রাহ্মণ সাহিত্য থেকে। অথর্ববেদ সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে তা অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও আদর্শগত বাতাবরণ সৃষ্ট হয়েছিল; একদিকে ছিল তিনটি বেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রয়োগবিধি-জনিত একমুখী সংস্কৃতি এবং অন্যদিকে অথর্ববেদ—যা কিছু মৌলিক উপায়ে ত্রয়ীর তুলনায় শুধুমাত্র ভিন্ন ছিল না, সম্পূর্ণ বিরোধিতাও করেছিল। পরবর্তীকালে অথর্ববেদের স্বীকৃতিলাভের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই ধারায় প্রচলিত গৃহ্য অনুষ্ঠানসমূহের প্রবল উপস্থিতি। সামূহিক শ্রৌত অনুষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে সামাজিক জীবন সম্পূর্ণত গড়ে উঠেছিল; জনসাধারণ তাদের পারিবারিক, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনযাপনে বহুবিধ বাধাবিয়ের সম্মুখীন হত-ব্রাহ্মণ সাহিত্য বা শ্রৌতসূত্রগুলি দিয়ে যাদের পুরোপুরি সমাধান করা যেত না। এইসব ক্ষেত্রে জিকরি প্রয়োজনসমূহ ছিল নিতান্ত বাস্তব ও পৌনঃপুনিক; এইগুলি অবস্থার উন্নতি সাধন, শাস্তিবিধান, প্রেতবিতাড়ন ও আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত আনুষ্ঠানিক প্রতিবিধান অনিবার্য করে তুলেছিল। অথর্ববেদ তার ব্যবস্থা করেছিল; সুদূর অতীত কাল থেকে বৈদিক ধর্মের পশ্চাৎপটে অথর্ববেদীয় পুরোহিতেরা সক্রিয় ছিলেন এবং জনসাধারণের বিপদে পড়ে তাদের শরণাপন্ন হতেন। তারপর ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ক্রমোন্নতিশীল ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রধানরা প্রতিবেশী রাজাদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত হওয়ার জন্য ঐন্দ্রজালিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। প্রাচীনতর ধর্মে এধরনের সুরক্ষার ব্যবস্থা খুব কমই ছিল; তাই অথর্ববেদীয় পুরোহিত যখন উদ্যোগী হলেন, তাকে রাজপুরোহিতরূপে নিয়োগ করা হল এবং কালক্রমে তার গোষ্ঠী ও মতবাদ বিলম্বিত স্বীকৃতি লাভ করল। এই স্বীকৃতি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত অনিচ্ছা! সত্ত্বেই দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু রাজপুরোহিত রূপে অথর্ববেদীয় পুরোহিত যেহেতু একটি নক্ষতাসম্পন্ন অবস্থান থেকে দরকষাকষি করতে সমর্থ ছিলেন। তাই তিনি আপন অধিকার অর্জন করে নিলেন। তার জয়ের স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে : সমগ্র যজ্ঞদক্ষিণার অর্ধেক অংশ একা ব্রহ্মার প্রাপ্য, বাকি

অর্ধেক হাোতা, উদগাতা ও অধিবর্ষর। অন্যভাবে বলা যায়, অন্য তিনজন পুরোহিত একত্রে যা লাভ করতেন, ব্রহ্মাশ্রেণীর পুরোহিত একই তা পেয়ে যেতেন। অথর্ববেদীয় পুরোহিতের ক্ষমতার অপর বাস্তব উৎস নিহিত ছিল গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল নিয়ন্ত্রণের মধ্যে—সেখানে তাঁর মতবাদ ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সমগ্র সূত্রসাহিত্য যেহেতু পরবর্তীকালে রচিত, গৃহ্যসূত্রগুলিতে শুধুমাত্র অথর্ববেদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির জয় প্রতিফলিত হয় নি, অন্যান্য বেদের শাখাগুলিতেও তার অন্তর্ভুক্তি প্রমাণিত হয়েছে। অথর্ববেদের পরিগ্রহণের পশ্চাতে রয়েছে লোকায়ত ধর্মের স্বীকৃতি অর্থাৎ নিজস্ব দেবতা, আচার অনুষ্ঠান, প্রত্নকথা ও বিশ্বাসসহ লঘু ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্তি। তাই এখানে আমরা বহু-সংখ্যক অপরিচিত অর্ধদেবতা, উপদেবতা, দানব ও পিশাচ প্রভৃতির সম্মুখীন হই, কেননা লোকায়ত ধর্ম মূলত এদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এসময়ে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উল্লেখ আমরা লক্ষ্য করি–হস্তরেখা-বিচার, সর্ববিধ ভবিষ্যৎ-কথন, জ্যোতির্বিদ্যা অর্থাৎ অন্তরিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ থেকে আহৃত শুভাশুভ গণনা, স্বপ্নবিশ্লেষণ করে আসন্ন ঘটনার পূর্বাভাস নির্ণয়, বস্ত্রে মুষিকদংশনের ফলে উদ্ভূত চিহ্ন ব্যাখ্যা করে ভবিষ্যদবাণী, অগ্নির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, বহুবিধ দেবতার প্রতি অর্পিত অর্ঘ্য, শুভাশুভ স্থান নিরাপণ, প্রেত-সঞ্চালন, সর্প নিয়ন্ত্রণ বিদ্যা, প্রেত্যাবিষ্ট বালিকার মাধ্যমে দেবতাদের পরামর্শ গ্রহণ, পরামদেবতার উপাসনা, ব্রতপালন ও মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা সন্তান-উৎপাদনের শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস ইত্যাদি।

এই পর্যায়ে জনপ্রিয় ধর্মের মধ্যে বৃহৎ ও লঘু ঐতিহ্যের যে বিচিত্র সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়, তার সম্ভাব্য কারণ এই যে, দুটি ধারার মধ্যে পরস্পর অভিমুখীনতা সর্বদা অব্যাহত ছিল। তাই দীর্ঘ-নিকায়ের মহাসময়সুত্তান্ত অংশে পৃথিবী ও বিশাল পর্বতসমূহের আত্মা, দিকসমূহের চারজন অধিপতি, গন্ধর্ব, নাগ, গরুঢ়, দানব এবং ব্রহ্মা, পরমাত্মা ও সনৎকুমার উল্লিখিত।

'বেদাঙ্গ'গুলিতে বিদেহী আত্মার উপাসনা অধিকতর প্রকট; কারণ আদিম মানুষের মানসিকতায় বিশ্বজগৎ বৈরিতাকামী মন্দ আত্মার পরিপূর্ণ যারা নিয়ত মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও সুখ আক্রমণ এবং ধ্বংস করতে উদ্যত। তাই বহুদূর পর্যন্ত গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলি আপাত-দৃষ্টিতে নেতিবাচক, মুখ্যত অমঙ্গল দূর করাই এগুলির উদ্দেশ্য।

শৌতি ও গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বিপুল অংশ এক সাধারণ বৃত্তের অন্তর্গত; যেমন অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, পিণ্ডপিতৃ যজ্ঞ এবং কিছু কিছু চাতুর্মাস্য অনুষ্ঠান উভয়বিধ গ্রন্থেই আলোচিত হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি মাত্র কল্পসূত্রই প্রচলিত ছিল; পরবর্তীকালে অনুষ্ঠানসমূহ বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী রচনাকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছিল। তিনটি যজ্ঞাগ্নির প্রয়োগদ্বারাও নির্ধারিত হত–কোন বিষয় কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত হবে; শ্রৌত যাগে যেহেতু এই তিনটি অগ্নিরই প্রয়োজন ছিল, তাই এই তিনটির যে কোনো একটি অগ্নিদ্বারা অনুষ্ঠিত যে কোনো যজ্ঞ প্রাচীনতম শ্রৌতসূত্র গুলিতে আলোচিত হয়েছিল এবং ফলত প্রত্যেকটি গৃহ্য অনুষ্ঠান তার অন্তর্ভুক্ত হল। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে এমন কিছু বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে যা গৃহ্যসূত্রগুলির পক্ষে উপযোগী; স্পষ্টত এর কারণ এই যে, সে সময় কোনো পৃথক সূত্র সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না–গৃহ্যসূত্রের তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। উপনয়ন, গার্হ্যপত্য অগ্নির প্রতিষ্ঠা, বিবাহ, মৃত্যু ও মরণোত্তর শ্রাদ্ধাদি এসবই মূলত গৃহ্যানুষ্ঠান—এগুলি ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতেও আলোচিত হয়েছে। যখন পৃথক শ্রেণীর রচনারূপে সূত্রগুলিতে আলোচিত হয়েছে। যখন পৃথক শ্রেণীর রচনারূপে সূত্রগুলি রচিত হতে লাগল, তখনো যে মিশ্র বিষয়বস্তুনির্ভর একটি সূত্র ছিল—তা আপস্তম্ব সূত্র থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম চৌদ্দটি অধ্যায়ে শ্রৌতসূত্রটি গঠিত; তারপর যথাক্রমে পরিভাষা ও গৃহসূত্রের মন্ত্রপাঠ অংশ পাওয়া যায়; শেষ দুটি অধ্যায়ে ধর্ম ও শুদ্ধৰ

সূত্রগুলি গঠিত হয়েছে। এর থেকে আমরা কল্পসূত্র সাহিত্যের স্পষ্ট ঐতিহাসিক স্তর সম্পর্কে অবহিত হই; এর প্রাথমিক স্তরে প্রতি শাখা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল।

সামূহিক বৈদিক যজ্ঞে তিনটি অগ্নি প্রয়োজনীয় ছিল-আহবনীয়, দক্ষিণা ও গার্হাপত্য–মোটামুটিভাবে এগুলি দেবতা, পিতৃপুরুষ ও মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এদের মধ্যে শুধুমাত্র গার্হাপত্য অগ্নি গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি দেবকাহিনীতে। ইড়া বা শ্রৌত যাগের যজ্ঞীয় হব্যের উৎস বর্ণিত হয়েছে। এটা যেহেতু মনু কর্তৃক নিবেদিত প্রথম পাক যজ্ঞে উদ্ভূত হয়েছিল, তাই কোনো পাক যজ্ঞে ইড়া নেই। প্রকৃতপক্ষে এই অনুপস্থিতি সামূহিক ও গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানগুলির প্রধান প্রতীকী পার্থক্যকে সূচিত করছে। এদিক দিয়ে এই শেষোক্ত অনুষ্ঠানগুলি প্রাচীনতর ও অধিকতর সর্বজনীন–সম্ভবত ইড়া আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে কোনও সময়ে এর উদ্ভব হয়েছিল।

ধর্ম (বেদাঙ্গসূত্র)

গৃহ্যসূত্রগুলি ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসের একটি অত্যন্ত কৌতুহলজনক ও তাৎপর্যপূর্ণ স্তরের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই সাহিত্য বৌদ্ধযুগের পরবর্তী এমন একটি সময়ে রচিত যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভিত্তি কঠোরতম আঘাতে পতনোম্মুখ। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম তাকে একদিক দিযে উন্মেষশীল দর্শন প্রস্থানগুলির সঙ্গে একটি আপোসে উপনীত হতে বাধ্য করেছিল—উপনিষদগুলিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে দিয়ে অবৈদিক অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, প্রত্নকথা, আচারবিধি প্রভৃতির অস্তিত্বকে স্বীকার করতে তা বাধ্য হয়েছিল এবং অব্যাহত ও ব্যাপক আর্যীকরণের মাধ্যমে এই

স্বীকৃতি একটি বিশেষ চরিত্র অর্জন করল। এই প্রক্রিয়া বহুমন্ত্রের অসংগতির মধ্যে আভাসিত হয় যাদের সঙ্গে আলোচ্য অনুষ্ঠানের কোনো সম্ভাব্য সম্পর্ক নেই। এই ধর্মমতের মধ্যে প্রতিমা, মন্দির, পবিত্র অরণ্য, ব্রতকথা এবং অন্যান্য পৌরাণিক উপাদান অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল; এইসব পৌরাণিক উপাদানকে আর্যরূপ দান করার একটি অন্তিম প্রচেষ্টার দ্বারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আয়ুষ্কাল প্রসারিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক ও অবৈদিক গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান সংমিশ্রিত হেয় একটি চরিত্রের গার্হস্থ্য ধর্ম উদ্ভূত হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল; গৃহ্যসূত্রগুলি এই আচার পদ্ধতিকে বিধিবদ্ধ করে তাদের সম্রাম ও নিষ্ঠার গুণে অন্বিত করতে চেয়েছিল।

গৃহ্যসূত্রের উৎস

একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক দিয়ে গৃহ্যসূত্রগুলি ব্রাহ্মণ সাহিত্য ও অথর্ববেদ থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভব হয়েছে। আর শ্রৌতসূত্রগুলি উদ্ভূত হয়েছে শুধু ব্রাহ্মণ সাহিত্য থেকে। অথর্ববেদ সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে তা অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও আদর্শগত বাতাবরণ সৃষ্ট হয়েছিল; একদিকে ছিল তিনটি বেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রয়োগবিধি-জনিত একমুখী সংস্কৃতি এবং অন্যদিকে অথর্ববেদ—যা কিছু মৌলিক উপায়ে ত্রয়ীর তুলনায় শুধুমাত্র ভিন্ন ছিল না, সম্পূর্ণ বিরোধিতাও করেছিল। পরবর্তীকালে অথর্ববেদের স্বীকৃতিলাভের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই ধারায় প্রচলিত গৃহ্য অনুষ্ঠানসমূহের প্রবল উপস্থিতি। সামূহিক শ্রৌত অনুষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে সামাজিক জীবন সম্পূর্ণত গড়ে উঠেছিল; জনসাধারণ তাদের পারিবারিক, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনযাপনে বহুবিধ বাধাবিয়ের সম্মুখীন হত-ব্রাহ্মণ সাহিত্য বা শ্রৌতসূত্রগুলি দিয়ে যাদের পুরোপুরি সমাধান করা যেত না। এইসব ক্ষেত্রে জিকরি প্রয়োজনসমূহ ছিল নিতান্ত বাস্তব ও

পৌনঃপুনিক; এইগুলি অবস্থার উন্নতি সাধন, শাস্তিবিধান, প্রেতবিতাড়ন ও আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত আনুষ্ঠানিক প্রতিবিধান অনিবার্য করে তুলেছিল। অথর্ববেদ তার ব্যবস্থা করেছিল; সুদূর অতীত কাল থেকে বৈদিক ধর্মের পশ্চাৎপটে অথর্ববেদীয় পুরোহিতেরা সক্রিয় ছিলেন এবং জনসাধারণের বিপদে পড়ে তাদের শরণাপন্ন হতেন। তারপর ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ক্রমোন্নতিশীল ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রধানরা প্রতিবেশী রাজাদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত হওয়ার জন্য ঐন্দ্রজালিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। প্রাচীনতর ধর্মে এধরনের সুরক্ষার ব্যবস্থা খুব কমই ছিল; তাই অথর্ববেদীয় পুরোহিত যখন উদ্যোগী হলেন, তাকে রাজপুরোহিতরূপে নিয়োগ করা হল এবং কালক্রমে তার গোষ্ঠী ও মতবাদ বিলম্বিত স্বীকৃতি লাভ করল। এই স্বীকৃতি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত অনিচ্ছা! সত্ত্বেই দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু রাজপুরোহিত রূপে অথর্ববেদীয় পুরোহিত যেহেতু একটি নক্ষতাসম্পন্ন অবস্থান থেকে দরকষাকষি করতে সমর্থ ছিলেন। তাই তিনি আপন অধিকার অর্জন করে নিলেন। তার জয়ের স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে : সমগ্র যজ্ঞদক্ষিণার অর্ধেক অংশ একা ব্রহ্মার প্রাপ্য, বাকি অর্ধেক হা্েতা, উদগাতা ও অধিবর্ষর। অন্যভাবে বলা যায়, অন্য তিনজন পুরোহিত একত্রে যা লাভ করতেন, ব্রহ্মাশ্রেণীর পুরোহিত একই তা পেয়ে যেতেন। অথর্ববেদীয় পুরোহিতের ক্ষমতার অপর বাস্তব উৎস নিহিত ছিল গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল নিয়ন্ত্রণের মধ্যে—সেখানে তাঁর মতবাদ ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সমগ্র সূত্রসাহিত্য যেহেতু পরবর্তীকালে রচিত, গৃহ্যসূত্রগুলিতে শুধুমাত্র অথর্ববেদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির জয় প্রতিফলিত হয় নি, অন্যান্য বেদের শাখাগুলিতেও তার অন্তর্ভুক্তি প্রমাণিত হয়েছে। অথর্ববেদের পরিগ্রহণের পশ্চাতে রয়েছে লোকায়ত ধর্মের স্বীকৃতি অর্থাৎ নিজস্ব দেবতা, আচার অনুষ্ঠান, প্রত্নকথা ও বিশ্বাসসহ লঘু ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্তি। তাই এখানে আমরা বহু-সংখ্যক অপরিচিত অর্ধদেবতা, উপদেবতা, দানব ও পিশাচ

প্রভৃতির সম্মুখীন হই, কেননা লোকায়ত ধর্ম মূলত এদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এসময়ে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উল্লেখ আমরা লক্ষ্য করি–হস্তরেখা-বিচার, সর্ববিধ ভবিষ্যৎ-কথন, জ্যোতির্বিদ্যা অর্থাৎ অন্তরিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ থেকে আহৃত শুভাশুভ গণনা, স্বপ্নবিশ্লেষণ করে আসন্ন ঘটনার পূর্বাভাস নির্ণয়, বস্ত্রে মুষিকদংশনের ফলে উদ্ভূত চিহ্ন ব্যাখ্যা করে ভবিষ্যদবাণী, অগ্নির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, বহুবিধ দেবতার প্রতি অর্পিত অর্ঘ্য, শুভাশুভ স্থান নিরাপণ, প্রেত-সঞ্চালন, সর্প নিয়ন্ত্রণ বিদ্যা, প্রেত্যাবিষ্ট বালিকার মাধ্যমে দেবতাদের পরামর্শ গ্রহণ, পরামদেবতার উপাসনা, ব্রতপালন ও মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা সন্তান-উৎপাদনের শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস ইত্যাদি।

এই পর্যায়ে জনপ্রিয় ধর্মের মধ্যে বৃহৎ ও লঘু ঐতিহ্যের যে বিচিত্র সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়, তার সম্ভাব্য কারণ এই যে, দুটি ধারার মধ্যে পরস্পর অভিমুখীনতা সর্বদা অব্যাহত ছিল। তাই দীর্ঘ-নিকায়ের মহাসময়সুত্তান্ত অংশে পৃথিবী ও বিশাল পর্বতসমূহের আত্মা, দিকসমূহের চারজন অধিপতি, গন্ধর্ব, নাগ, গরুঢ়, দানব এবং ব্রহ্মা, পরমাত্মা ও সনৎকুমার উল্লিখিত। ‘বেদাঙ্গ’গুলিতে বিদেহী আত্মার উপাসনা অধিকতর প্রকট; কারণ আদিম মানুষের মানসিকতায় বিশ্বজগৎ বৈরিতাকামী মন্দ আত্মার পরিপূর্ণ যারা নিয়ত মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও সুখ আক্রমণ এবং ধ্বংস করতে উদ্যত। তাই বহুদূর পর্যন্ত গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলি আপাত-দৃষ্টিতে নেতিবাচক, মুখ্যত অমঙ্গল দূর করাই এগুলির উদ্দেশ্য।

শৌতি ও গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বিপুল অংশ এক সাধারণ বৃত্তের অন্তর্গত; যেমন অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, পিণ্ডপিতৃ যজ্ঞ এবং কিছু কিছু চাতুর্মাস্য অনুষ্ঠান উভয়বিধ গ্রন্থেই আলোচিত হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি মাত্র কল্পসূত্রই প্রচলিত ছিল; পরবর্তীকালে অনুষ্ঠানসমূহ বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি

অনুযায়ী রচনাকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছিল। তিনটি যজ্ঞাগ্নির প্রয়োগদ্বারাও নির্ধারিত হত–কোন বিষয় কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত হবে; শ্রৌত যাগে যেহেতু এই তিনটি অগ্নিরই প্রয়োজন ছিল, তাই এই তিনটির যে কোনো একটি অগ্নিদ্বারা অনুষ্ঠিত যে কোনো যজ্ঞ প্রাচীনতম শ্রৌতসূত্র গুলিতে আলোচিত হয়েছিল এবং ফলত প্রত্যেকটি গৃহ্য অনুষ্ঠান তার অন্তর্ভুক্ত হল। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে এমন কিছু বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে যা গৃহ্যসূত্রগুলির পক্ষে উপযোগী; স্পষ্টত এর কারণ এই যে, সে সময় কোনো পৃথক সূত্র সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না–গৃহ্যসূত্রের তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। উপনয়ন, গার্হ্যপত্য অগ্নির প্রতিষ্ঠা, বিবাহ, মৃত্যু ও মরণোত্তর শ্রাদ্ধাদি এসবই মূলত গৃহ্যানুষ্ঠান—এগুলি ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতেও আলোচিত হয়েছে। যখন পৃথক শ্রেণীর রচনারূপে সূত্রগুলিতে আলোচিত হয়েছে। যখন পৃথক শ্রেণীর রচনারূপে সূত্রগুলি রচিত হতে লাগল, তখনো যে মিশ্র বিষয়বস্তুনির্ভর একটি সূত্র ছিল—তা আপস্তম্ব সূত্র থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম চৌদ্দটি অধ্যায়ে শ্রৌতসূত্রটি গঠিত; তারপর যথাক্রমে পরিভাষা ও গৃহসূত্রের মন্ত্রপাঠ অংশ পাওয়া যায়; শেষ দুটি অধ্যায়ে ধর্ম ও শুদ্ধৰ সূত্রগুলি গঠিত হয়েছে। এর থেকে আমরা কল্পসূত্র সাহিত্যের স্পষ্ট ঐতিহাসিক স্তর সম্পর্কে অবহিত হই; এর প্রাথমিক স্তরে প্রতি শাখা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল।

সামূহিক বৈদিক যজ্ঞে তিনটি অগ্নি প্রয়োজনীয় ছিল-আহবনীয়, দক্ষিণা ও গার্হাপত্য–মোটামুটিভাবে এগুলি দেবতা, পিতৃপুরুষ ও মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এদের মধ্যে শুধুমাত্র গার্হাপত্য অগ্নি গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি দেবকাহিনীতে। ইড়া বা শ্রৌত যাগের যজ্ঞীয় হব্যের উৎস বর্ণিত হয়েছে। এটা যেহেতু মনু কর্তৃক নিবেদিত প্রথম পাক যজ্ঞে উদ্ভূত হয়েছিল, তাই কোনো পাক যজ্ঞে ইড়া নেই। প্রকৃতপক্ষে এই অনুপস্থিতি সামূহিক ও গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানগুলির প্রধান প্রতীকী পার্থক্যকে

সূচিত করছে। এদিক দিয়ে এই শেষোক্ত অনুষ্ঠানগুলি প্রাচীনতর ও অধিকতর সর্বজনীন–সম্ভবত ইড়া আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে কোনও সময়ে এর উদ্ভব হয়েছিল।

ধর্মসূত্র

ধর্মসূত্রের মধ্যে দিয়ে আমরা একটি নুতন যুগে প্রবেশ করি। কারণ যদিও প্রত্যক্ষভাবে তা বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিক সাহিত্যের অংশ, তথাপি যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। প্রথম তিনটি বর্ণ–ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জীবনের চতুরাশ্রমকে (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও যতি) কেন্দ্র করে সামাজিক জীবনধারার পরিচয় ধর্মসূত্রগুলিতে পাওয়া যায়। সামাঙ্গিক সামঞ্জস্য রচনা যদিও এদের প্রধান লক্ষ্য, তবু উপনিষদের পরে এই সমাজে বর্ণভেদ প্রথা ধীরে ধীরে কঠোরতর হয়ে উঠেছিল। বর্ণগুলির মধ্যে চলিষ্ণুতা ক্রমেই অতীতের বস্তু হয়ে পড়ছিল। পূর্ববর্তী যুগগুলিতে অসবর্ণ বিবাহের ফলে যেসমস্ত অসংখ্য নুতন মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হয়েছিল, তাদের জন্য সমাজে উপযুক্ত স্থান ও যথাযথ কর্তব্য, অধিকার ও অপরিহার্য দায়িত্ব নির্দেশ করা আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে ভারতীয় সামাজিক জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার পক্ষে ধর্মসূত্রগুলি আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল। এই যুগে জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপুল পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, তার নিম্নোক্ত নিদর্শনগুলি উল্লেখ করা যায় : লৌহনির্মিত অস্ত্র এবং কৃষি ও শিল্প সম্পর্কিত যন্ত্র ও উপকরণের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, বাণিজ্য, নগররাষ্ট্রের উদ্ভব। বণিকদের হাতে বিপুল সম্পদের কেন্দ্রীভবন,

প্রাথমিক উৎপাদকদের ক্রমাগত দারিদ্র্যবৃদ্ধি, উৎপাদক ও উৎপন্ন দ্রব্যের ভোক্তার মধ্যে সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ, শ্রেণীভেদ, কারুশিল্প ও কুটিরশিল্প-নির্ভর অর্থনীতিতে শূদ্রের বিপুল শোষণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অংশত রাজনৈতিক শক্তি সেইসব ব্যক্তিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া, খনি ও খনিজ দ্রব্য যাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সশস্ত্র রক্ষীরূপে যারা বাণিজ্য শকটের অনুগমণ করত। অর্থাৎ সমাজের নূতন প্রভু ছিল নবোদগত বণিকশ্রেণী ও অভিজাতবর্গ, অর্থাৎ বিত্তবাণ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়। তিনটি আর্যবর্ণের পুরুষরা যেহেতু শক্তিশালী পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় স্বভাবত বিপুল ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাই শূদ্র ও নারী ক্রমশ অধিকতর নিষ্পেষণের সম্মুখীন হল।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে কয়েক শতাব্দীব্যাপী মিশ্রণ এবং সমস্ত প্রকার সম্ভাব্য পারস্পরিক বিনিময় ও সংযোগের মাধ্যমে বহু উপবর্ণের উৎথানের ফলে এমন একটা সময় উপস্থিত হল যখন বর্ণপ্রথা-শাসিত সমাজের সীমারেখা কতকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল; ফলে সমস্ত নবোদ্ভূত বর্ণের সামাজিক অবস্থান ও কর্তব্য নির্দেশ করা সম্ভব হল। অনুরূপভাবে, গৃহস্থদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য অর্থাৎ নিয়মিত যজ্ঞ সম্পাদনের উপর বৈদিক সাহিত্যের অতি স্পষ্ট গুরুত্ব আরোপ এবং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বা ভ্রমমাণ যোগীদের প্রভাবে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী প্রক্রিয়ার মধ্যে সুদীর্ঘ দ্বন্দ্বমুখর সংগ্রামের পরে শেষপর্যন্ত আপোসের একটি পথ আবিষ্কৃত হল—অরণ্যে অবসর জীবনযাপন এবং ভ্রমমাণ সন্ন্যাসীর জীবনকে মানুষের জীবনের শেষ দুটি স্তররূপে স্বীকৃতি দেওয়া হল। এই পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর কতকটা সামাজিক সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যার ফলে কোনোপ্রকার প্রধান প্রতিবন্ধক ছাড়াই সামাজিক জীবনের প্রবাহ অক্ষুন্ন থাকতে পারে। তবে এটা স্বীকার করা প্রয়োজন যে বিদ্রোহ বা আপোসবিরোধী মনোভাবের বিশেষ কোনো প্রমাণ যেহেতু আমাদের হাতে

নেই, তাই আমরা এটাও ধরে নিতে পারি না যে এই সুদীর্ঘ পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বস্তুত এই যুগে বহু বৈদিশিক আক্রমণ, সামাজিক সংগঠনে অনেক নূতন উপাদানের আত্মীকরণ, বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, পরস্পর-বিধবংসী ও পররাজ্য অধিকারের জন্য নগর ও রাষ্ট্র-মধ্যবর্তী যুদ্ধ ইত্যাদি আমরা লক্ষ্য করেছি; সুতরাং, বলাই বাহুল্য, যে এই যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ছিল সংঘাতে আকীর্ণ।

এ ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্রকে নূত্যূনতম পর্যায়ে হ্রাস করে আনাই ছিল ধর্ম সূত্রগুলির দায়িত্ব। এই পর্যায়েই কর্ম ও জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব বিশেষ অভিব্যক্তি লাভ করল–এই দুটি অতুলনীয় মতবাদ সমস্ত প্রকার সামাজিক অসাম্যের চমৎকার ব্যাখ্যা দান করে সমাজে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিল। এই যুগের ধর্ম ও দর্শন মৌল ভাবাদর্শগত ভিত্তি স্থাপন করার ফলে ধর্মসূত্রের রচয়িতারা উপযুক্ত নিয়ম প্রণয়ন করে সামাজিক বিধি ব্যবস্থাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেন এবং সেই সঙ্গে বিভেদকামী শক্তিগুলিকে অধার্মিক ও অসামাজিক আখ্যা দিয়ে চুর্ণ করে দিতে চাইলেন। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে অনুষ্ঠানগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি এবং নুতন অর্চনাপদ্ধতি ও নূতন দেবতাদের প্রবর্তন রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত—যা সেযুগের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ। নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সার্বভৌম কৌশলরূপে পুরোহিত ও অনুষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করতেন।

ধর্মসূত্রের বিধিসমূহের প্রকৃত ক্ষেত্র হল বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমগুলি; তবে বাস্তবে এদের ক্ষেত্র আরো বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ধর্মসূত্রগুলিতে শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্রপামহের প্রাগাবস্থান আভাসিত এবং প্রকৃতপক্ষে সেগুলি এদের সম্পূরক। ধর্মসূত্রে ব্যাখ্যা ‘ধর্ম কি, এই প্রশ্নের উত্তরে জৈমিনি তার

মীমাংসা সূত্রে বলেছেন : ‘ধর্ম মানুষকে যথার্থ শ্রেয় আচরণে প্রণোদিত করে’, এবং এই শ্রেয় আচরণের তৎকালীন ভিত্তি ছিল বর্ণাশ্রম।

সমাজ (বেদাঙ্গসূত্র)

সামাজিক সম্পর্ক ও পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিক গ্রামীণ কারুশিল্পী ও গৃহং ত্যরূপে যে শূদ্ররা কর্মে নিরত থাকত তাদের প্রায়ই নারী ও হীনতার জন্তুর সঙ্গে একত্র উল্লেখ করা হয়েছে; শূদ্রকে অপরিচ্ছন্ন ও সামাজিকভাবে হেয় বলে বিবেচনা করা হত। শূদ্রের জন্য কোনও গৃহ্য অনুষ্ঠান নির্দেশিত হয় নি। এর একটি কারণ সম্ভবত এই যে, যেহেতু আদিম অধিবাসীদের বিপুল অংশ–বিশেষত যারা আর্যদের দ্বারা পরাজিত বা সামাজিকভাবে অধিকৃত হয়েছিল—তারা তাদের নিজস্ব সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি অব্যাহত রেখেছিল এবং যেহেতু আর্যরা এই বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে আর্য সংস্কৃতির বৃত্তে একাত্মীভূত করে নিতে চাননি। তাই তারা এই জনগোষ্ঠীকে তাদের অভ্যস্ত রীতিতে জীবন-নির্বাহ করতে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো বাধা দেননি যতক্ষণ পর্যন্ত এরা অল্পমূল্যে নিজেদের শ্রমশক্তি যোগান দিয়ে গেছে। আর্যদের জীবনদৃষ্টিতে ধর্মান্তরীকরণের প্রাধান্য কখনও ছিল না। শূদ্র দাসগণ যে প্রায়ই পালিয়ে যেতে চাইত, তা বিশেষভাবে তাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য ঘৃণা ও অমানবিক শাস্তিবিধান থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। বস্তুত প্রাচীনতর সাহিত্যের নিদর্শন থেকেও শূদ্রের সামাজিক হীনতার প্রমাণ পাওয়া যায় : পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে শূদ্র কোনও দেবতার আশ্রয় ছাড়াই জন্মগ্রহণ করে

(৬ : ১ : ১১) এবং জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে অপরের পাদ-প্রক্ষালন করেই শূদ্র জীবনধারণ করে। (১ : ৬৮, ৬৯)।

সমাজে নারীর অবস্থান মূলত এই তথ্য দ্বারা নির্ধারিত হত যে তাদের অনেকেই অনার্য পরিবার-সম্ভূত হওয়ায় যজ্ঞানুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণের কোনো অধিকার ছিল না। যে কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়, সেসব ক্ষেত্রেও মন্ত্রপাঠের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। অবশ্য গোভিল গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে নারী সন্ধ্যায় গৃহে বৈশ্বদেববলি অর্পণ করতে পারে, অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের একটি নিয়ম অনুযায়ী পত্নী প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আহুতি অর্পণ করতে পারে যেহেতু, গোভিল গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী "পত্নী হল গৃহ এবং অগ্নিগৃহ্য' (১ : ৩ : ১৬) সেক্ষেত্রেও সে মন্ত্রোচ্চারণে অধিকারিণী ছিল না। স্বামীর ইচ্ছাই স্ত্রীকে যে নিয়ন্ত্রণ করত, তা বিবাহের মন্ত্র থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় (পারস্কার গৃহ্যসূত্র ১ : ৮ : ১১)। স্ত্রীর প্রাথমিক কর্তব্য ছিল স্বামীর প্রীতি-বিধান এবং সন্তান–বিশেষত পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া। সমাজের নিম্নতম স্তরে বহু দাসীর উপস্থিতি ছিল– প্রকৃতপক্ষে যারা বারাঙ্গনা অপেক্ষাও হীন অবস্থায় জীবনযাপন করত।

গৃহ্যসূত্রগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা যে কৌতুহলজনক তথ্য সম্পর্কে অবহিত হই, তা হল : বিদ্যার্থীর দীক্ষাগ্রহণ (উপনয়ন) এবং বিবাহের অনুষ্ঠান ও মন্ত্রের মধ্যে প্রশ্নাতীত সাদৃশ্য–যা দুটি অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অনুপুঙ্খের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। এর কারণ হয়ত এই যে, উভয় সম্পর্কই সামাজিক উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক চুক্তিরূপে গণ্য হত। কেননা বিবাহ হল সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় কর্ম, যে সন্তানপরম্পরা কায়িকভাবে আর্য জনগোষ্ঠীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখে; আবার, বেদাধ্যয়নে দীক্ষিত হয়ে আর্য পুরুষ স্বজাতির আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা অব্যাহত রাখে। যে যুগে অক্ষরজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়

নি, তখন, জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় রক্ষার পক্ষে এই প্রক্রিয়া ছিল আবশ্যিক; তাই দীক্ষানুষ্ঠান অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ও বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল–যা কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রজন্মের গণ্ডীকে অতিক্রম করে।

তখনকার পারিবারিক ব্যবস্থার একক ছিল প্রধানত যৌথ পরিবার; যদিও কিছু কিছু ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, একই গৃহে বিভিন্ন শাখার জন্য পৃথক পাকশালা ও পাকের ব্যবস্থা ছিল। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের উপর বিপুল গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। পরলোকগত আত্মা ভোগের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ও অপূর্ণ আকাঙ্খা দ্বারা পীড়িত হয়ে জীবিত মানুষের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হবে- তাই তাদের যথাযথভাবে শান্ত করা প্রয়োজন; বস্তুত এইখানেই শ্রাদ্ধের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। পুরোহিতদের পক্ষেও এটি ছিল অত্যন্ত লাভজনক অনুষ্ঠানগুলির অন্যতম। দ্রুত প্রসারণশীল দেবসঙ্ঘে এই পর্যায়ে কয়েকজন সম্পূর্ণ নুতন দেবতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। অমঙ্গলপ্রদ ও শুভসূচক আত্মার সংখ্যা ও ক্রিয়া যেহেতু ক্রমশ বর্ধিত হল, তাদের শাস্ত, নিয়ন্ত্রিত ও বরদানের পক্ষে অনুকুল করে তোলার জন্য যথাযথ অনুষ্ঠানেরর প্রয়োজনও বহুগুণ বর্ধিত হল। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ও সমুদ্রযাত্রায় তার উপযোগিতা অনুভূত হওয়ার গ্রহপূজার নূতন প্রবণতা দেখা গেল। ব্রহ্মাশ্রেণীর পুরোহিতের আসনে কুশ-নির্মিত প্রতীকী পুত্তলিকা স্থাপন করে যজমান নিজেই অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারতেন; এতে মনে হয় যে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানগুলিতে পুরোহিত নিয়োগ অপরিহার্য ছিল না।

গৃহ্যসূত্রগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল গর্ভধারণের পূর্ব পর্যন্ত স্বতন্ত্র সামাজিক এককরূপে নারীর জন্য কোনও পৃথক অনুষ্ঠানের বিধান ছিল না; পুত্র সন্তানের সম্ভাব্য জননীরূপে নারীর কতকটা গুরুত্ব ছিল। অন্যান্য সমস্ত গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে নারী কেবলমাত্র স্বামীর সহায়করূপে সক্রিয় থাকত। কিন্তু কখনো মন্ত্র উচ্চারণ করত না। শূদ্রের মতই নারী কোনো আনুষ্ঠানিক

পরিচিতির অধিকারী ছিল না। অবশ্য শূদ্রদের সামাজিক পরিচিতিও ছিল না; গৃহ্য ও ধর্মসূত্রগুলিতে শূদ্রকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে। যদিও কৃষিক্ষেত্রে ও ক্ষুদ্র শিল্পে শূদ্রগণ প্রধানত শ্রমশক্তির যোগান দিত। শূদ্র ভূত্যের ত্রুটি লক্ষ্য করলে প্রভু তার ইচ্ছামত নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দিতে পারত; গৃহ্যসূত্র সাহিত্যের বিপুল অংশে এধরনের শাস্তিকে অনুমোদন করা হয়েছে। ভূত্য বা দাস সম্পূর্ণরূপে প্রভুল দিয়ার অধীন ছিল; তাকে রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। "কোনো শূদ্র বা পতিত ব্যক্তি বা কুকুর খাদ্য স্পর্শ করলে তা অনুষ্ঠানের পক্ষে অশুদ্ধ বিবেচিত হত"। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের এই তালিকাটি (১ : ৫ : ১৬, ২১, ২২, ৩০) কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। শূদ্র ও নারী এই উভয়কে সম্পত্তিরূপে বিবেচনা করা হত, এমনকি এরা ছিল সামাজিক মর্যাদারও নিদর্শন; এদের সর্বদা কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখতে হত। অত্যন্ত বিরল কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া গৃহ্যসূত্রে জনসাধারণের বিপুল অংশের জীবনের চিত্র এমনই নৈরাশ্যজনক; ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু ব্যতিক্রম বস্তুত নিয়মকেই প্রমাণিত করে।

সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের অভ্যুত্থান ছিল আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তবে আমরা যেন এই তথ্য বিস্মৃত না হই যে,–সমাজে ব্রাহ্মণের তর্কাতীত প্রাধান্য, কর থেকে অব্যাহতি বা অন্যান্য বর্ণের জন্য আইনের মাধ্যমে বিহিত বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কর্কশ সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে ব্রাহ্মণের অব্যাহতি, বিভিন্ন প্রকার দানগ্রহণে তাদের স্বাভাবিক যোগ্যতা, সামাজিক প্রতিপত্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত ভাবে কেবলমাত্র জন্ম পরিচয়ের উপরই নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এই সমস্তই ছিল সমাজের পরবর্তী স্তরের পরিচায়ক। খ্রিস্টপূর্ব তিনশ থেকে খ্রিস্টীয় একশ অব্দের মধ্যে কোনো শিলালিপিতে কোনো ব্রাহ্মণ বা সুনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান বা মন্দিরের উল্লেখ নেই। ব্রাহ্মণের প্রতি প্রথম ভূমিদানি লিপি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হয়েছিল এবং এধরনের ভূমিদানি

পরবর্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে প্রকৃতই অসংখ্যবার লিপিবদ্ধ হয়েছিল–এই যুগেই গৃহ্যসূত্রের অন্তিম পর্যায়টি আত্মপ্রকাশ করে। যাইহাে‌ক, বৈদেশিক আক্রমণকারীদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে কঠোর বর্ণবিভক্ত সমাজের ভিত্তিভূমি প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। তাই সম্ভবত সূত্রসাহিত্যে সমাজপতিদের প্রাচীন সমাজ সংগঠন অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াসই শুধুমাত্র অভিব্যক্ত হয় নি, শূদ্র এবং সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত অংশের প্রতিরোধের লক্ষণও প্রতিফলিত হয়েছে–এরা সম্ভবত ক্রমেই অস্পষ্টভাবে হলেও এই উপলব্ধিতে উপনীত হচ্ছিল সে সমাজের উৎপাদক শক্তিরূপে তাদের মৌলিক অবদান রয়েছে।

গৃহ্যসূত্রে প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহ সংহিতা থেকে কখনো প্রত্যক্ষভাবে ঋণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে আবার কখনো বা অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে রচিত হয়েছে। এই দুই ধরনের মন্ত্র বিশ্লেষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে এরা শুধু দুটি ঐতিহ্যের প্রতিনিধিমাত্র নয়, সূত্র সাহিত্যের দুটি সুস্পষ্ট স্তরেরও নিদর্শনও বহন করছে। বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য রচিত এবং সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অন্তর্গত নয় এমন মন্ত্র নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণভাবে উপযোগী ও প্রয়োজনীয় হলেও যেসব মন্ত্র সংহিতা ও ব্রাহ্মণ থেকে গৃহীত হয়েছে-তাদের অধিকাংশই কৃত্রিমভাবে নির্বাচিত এবং তাদের উপযোগিতাও নেই বললেই চলে। এটা থেকে সম্ভবত এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলি একটি বিশেষ পর্যায়ে শ্রৌত অনুষ্ঠান অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সঙ্গে অসম্পৃক্তভাবে বিরাজিত ছিল। যজ্ঞধর্ম যখন বৌদ্ধধর্মদ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হল, তখনই গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে প্রামাণ্য ও সন্মানিত করে তোলার একটি প্রবণতা সৃষ্টি হল- অথর্ববেদের স্বীকৃতিলাভের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই নিবিড়; রক্ষণশীল বৃহৎ ঐতিহ্যে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অনুষ্ঠানসমূহ অর্ধদেবতা এবং বিভিন্ন ধরনের যক্ষ, অপ্সরা, পিশাচ, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতির উদ্ভব ও

স্বীকৃতিলাভের ফলে কতকটা যান্ত্রিকভাবেই গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুলি গৃহীত হল। সেই সঙ্গে বৈদিকযুগের অন্তিম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটল–যার সূচনা হয়েছিল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ও ব্রাহ্মণ সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে। বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত অধিকাংশ ইন্দ্রজালতুল্য মন্ত্র যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল থেকে গৃহীত হয়েছে, তাতেও এ অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে পরিশীলিত করার প্রক্রিয়াই শুধু এই পর্যায়ে হয় নি, স্পষ্টত প্রাচীনতর ভাসমান লোকায়ত উপাদানের স্বীকৃতিদানও তখন ঘটেছিল। লোকবিশ্বাস ও আচারের যেসব উল্লেখ সূর্যসূক্তে পাওয়া যায় এবং গন্ধর্বচর্যার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক আভাসিত তা সুস্পষ্টভাবে লঘু ঐতিহ্যেরই অন্তর্গত। এই পর্যমেই তা রক্ষণশীল শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল।

রচনাকাল (ধর্মসূত্র)

অধিকাংশ ধর্মসূত্র খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল যদিও এর উচ্চতর ও নিম্নতর সীমা আমরা আরও কিছুদূর প্রসারিত করতে পারি। এই কালসীমা ভারতবর্ষের ইতিহাসে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পরবর্তী দুই সহস্র বৎসর ধরে যে সব চিন্তা ও ধারণা ভারতীয় ধর্ম ও সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সেগুলির উদ্ভব এইযুগেই।